সুখের-মিলন।

(সত্য-ঘটনা-মূলক উপন্যাস)

শ্রীচিন্তামণি শীল
প্রণীত।

প্রকাশক
শ্রীচিন্তামণি শীল।
চোরবাগান, কলিকাতা।
১৩২২।

কলিকাতা,
১৪৭ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, যোড়াসাঁকো,
ফাইন আর্ট প্রিন্টিং সিণ্ডিকেট্,
শ্রীপ্রিয়নাথ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

মুখবন্ধ।

সাহিত্য-ভূমিতে চিত্রাঙ্কণ করা দূরে থাক, সামান্য আঁচড় কাটিলেই কৈফিয়ৎ দিতে হয়। এই কৈফিয়তই ভূমিকা, মুখবন্ধ, রচয়িতার নিবেদন; প্রবেদন ইত্যাদি বিভিন্ন নামে বিদিত হয়। আকাঙ্ক্ষার প্রবল তাড়নায় সাহিত্যক্ষেত্রে হঠাৎ অনধিকার প্রবেশ করিয়া সেখানে ফসল নষ্ট, অযথা আচরণ ও ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছি। অতএব আমার সবিনয় নিবেদনই তাহার কৈফিয়ৎ।

এই আখ্যায়িকাটি একটি সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে লিখিত ; কিন্তু অতিরঞ্জিত নহে। আমার ভাষায় জ্ঞান নাই, ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি নাই, অথচ এই সত্য ঘটনাটি দেখিয়া পুস্তিকা প্রণয়ন রূপ কণ্ডুয়নের জ্বালা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি নাই। ইহাতে অনেক ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গেল। অতএব সাহিত্যিকগণ আমার এই জ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া মহানুভবতার পরিচয় দিবেন।

আমার সবিনয় নিবেদন এই যে,—এই পুস্তিকা প্রণয়নে আমি আমার অন্যতম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু আভাসচন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি তজ্জন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। ভগবানের দয়ায় ও তাঁহার সহায়তায় এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি প্রকাশিতহইল।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমার বন্ধুবান্ধব ও সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণকে আমি সাদরে উপহার দিলাম। তাঁহারা ইহা ধৈর্য্য ধরিয়া, বন্ধুর ত্রুটি মার্জ্জনীয় জ্ঞানে, আদ্যোপান্ত পড়িয়া কিছুমাত্র আনন্দ উপভোগ করিলে, আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

আশ্বিন,
১৩২২ সাল।

শ্রীচিন্তামণি শীল।

শ্রীশ্রী৺রাধাদামোদর জয়তি।

উৎসর্গ।



আমার

পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেবের

শ্রীচরণ-কমলে

আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি

উৎসর্গ করিয়া

কৃতার্থ হইলাম।

কলিকাতা,
চোরবাগান।

অধম সন্তান
শ্রীচিন্তামণি।

পুস্তক সংখ্যা



সুখের-মিলন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।



বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রে বেলা ১২টার সময় চন্দন নগর হইতে দক্ষিণাভিমুখে যে বড় রাস্তা গিয়াছে, সেই পথে দুইটী যুবক যাইতেছিল, একটীর বয়স অনুমান ২৮ বৎসর, আর অপরটী ১০ বৎসরের ছোট। উহারা দুইটী সহোদর ভাই; যুবক দুইটীকে দেখিলে বোধ হয়, তাহারা আমদের বঙ্গদেশীয় লোক—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ও বলিষ্ঠ। উক্ত গ্রাম্য রাস্তাটির দৃশ্য অতিশয় মনোহর—সুদূর দুই পার্শ্বে বিটপী শ্রেণী গগন ভেদ করিয়া বিরাজ করিতেছে, মস্তকে সুনীল আকাশ আবরণ করিয়া রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে বৃক্ষোপরি হইতে কোমল কণ্ঠে পাপিয়া মধুর স্বর বর্ষণ করিয়া পথশ্রান্ত, বৃক্ষছায়ায় উপবিষ্ট পথিকের মন কথঞ্চিৎ উল্লসিত করিতেছে।

অনেক দুর আসিয়া যতীন তাহার বড় দাদা নরেন্দ্রকে বলিল— দাদা, আমাদের এখনও অনেক দূর যাইতে হইবে। আমরা বড় রাস্তা দিয়া না আসিয়া গ্রামের ভিতরের পথে আসিলে, এতক্ষণে বাটী পৌঁছিতাম, রৌদ্রে আমাদের এত কষ্ট পাইতে হইত না। যাহা হউক, রৌদ্রের তাপে আমার বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে; একটু জল পান করিয়া বিশ্রাম করিলে ভাল হয় না?

নরেন্দ্র। ভাই যতীন, এখান হইতে আমাদের বাটী ত আর বেশী দূর নয়। ঐ দেখ, আমাদের বাটী মাঠের ওপারে দেখা যাইতেছে, আমাদের সকাল সকাল বাটী ফিরিবার কথা। মা বাবা আমাদের জন্য কতই না ভাবিতেছেন। তবে তোমার যদি বেশী কষ্টবোধ হয় তাহা হইলে এইখানে এস, একটু বিশ্রাম লওয়া যাক, এই বলিয়া দুইটী ভায়ে একটি বড় বটবৃক্ষের ছায়ায় আসিয়া বসিল এবং উত্তরীয় দ্বারা দেহের ঘাম মুছিয়া তদ্দ্বারা হাওয়া খাইতে লাগিল।

নরেন্দ্রও বড় কম শ্রান্ত হন নাই। সুশীতল ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তিনি তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং যতীন তাঁহাকে তদবস্থা দেখিয়া জাগরিত করিতে সাহসী হইলেন না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যতীনের বড়ই জল তৃষ্ণা পাইয়াছিল। তিনি কিছুক্ষণ জ্যেষ্ঠের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে ব্যজন করার পর, নিজের জল তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নিকটস্থ কোন ভাল পুষ্করিণীর সন্ধান করিতে লাগিলেন।

সম্যক্ চেষ্টার ফল অবশ্যম্ভাবী। শীঘ্রই তিনি একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী দেখিতে পাইয়া তদভিমুখে যাইলেন। পুষ্করিণীর জল অতি স্বচ্ছ, ঘাটে যাইবার একটি পাকা সিঁড়ি এখানে ওখানে ভাঙ্গিয়া

পড়িয়া কালের কঠোর শাসনের পরিচয় দিতেছে। যতীন হাত পা মুখ ধুইয়া অঞ্জলি করিয়া জল পান করিলেন ও কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে পুকুরের অপর পাড়ে কতকগুলি ক্রীড়া-নিরতা বালিকা তাঁহার নয়নপথে পড়িল। বালিকাগণের মধ্যে তিন চারি জন কিশোর বয়স্কা; কিন্তু সকলেই অবিবাহিতা বলিয়া বোধ হইল। যতীন কয়েক পদ ফিরিয়া আসিতে না আসিতেই এক করুণ চীৎকার ও তৎসঙ্গে ক্রন্দন ধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। অবিলম্বে তিনি সত্বর পদে ক্রন্দনধ্বনি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়া সেই পুকুরের পাড়ে আসিয়া দেখেন যে, বালিকাগণের মধ্যে তিন চারিটি কোমর জলে নামিয়া কি খুঁজিতেছে ও কাঁদিতেছে। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তীরস্থ একটি বালিকা তাঁহার কাছে আলুথালু বেশে দৌড়িয়া আসিয়া ভয়-কম্পিত-স্বরে বলিল, মহাশয়, সর্ব্বনাশ হইয়াছে; আমাদের সুশী জলে এইমাত্র ডুবিয়া গেল এবং অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা পুকুরের ঘাটের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতে না দিতেই যতীন অনুমানে সমস্ত বুঝিয়া জলস্থ অপর বালিকাগণকে নিমেষে তীরের দিকে সরাইয়া দিয়া নিজের গলাজলে নামিয়া এক ডুব দিলেন এবং পর মুহূর্ত্তেই একটী পরমাসুন্দরী বালিকার সলিলসিক্ত মৃতপ্রায় দেহ স্কন্ধে করিয়া তীরে উঠিয়াই দুই হস্তে সবলে মাথার উপরে ধরিয়া দুই তিন বার ঘুরাইতেই বালিকার মুখ ও নাক দিয়া কতকটা জল উদ্গীরণ হইয়া গেল এবং বালিকাকে শয়ন করাইয়া তাহার শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বিদিত কয়েকটি ক্রিয়া শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি যতীন ঐ বালিকার নাসিকার নিকট হাত লইয়া গিয়া দেখিলেন যে, বালিকার অতি ক্ষীণভাবে নিশ্বাস বহিতেছে।

ইহা দেখিয়া যতীনের মন আহ্লাদে আপ্লুত হইল এবং নিকটস্থ স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক বালিকাগুলিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, ভগবানের কৃপায় তোমাদের বন্ধু বাঁচিয়া গিয়াছেন, তোমাদের কোন ভয় নাই; কিন্তু তোমাদের একটী কাজ করিতে হইবে আমায় একটি পাত্রে করিয়া খাবার জল ও একটু গরম দুধ আনিয়া দাও, দেখিও যেন দেরি না হয়।

ইহা শুনিয়া তাহাদিগের ভিতর একজন দৌড়িয়া জল ও দুধ আনিতে গেল। ইতিমধ্যে যতীন বালিকার মস্তকে তাহার চাদর দিয়া বাতাস দিতে লাগিলেন, বাতাস করিতে করিতে বালিকাটির অল্প জ্ঞানের লক্ষণ দেখা দিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পর বালিকাটির সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল এবং এক অপরিচিত সুন্দর যুবককে পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সে উঠিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু পারিল না; এবং যতীন সযত্নে নিবারণ করিয়া বলিলেন, আপনি উঠিবার চেষ্টা করিবেন না, আপনার শরীর বড়ই কাহিল হইয়াছে, এই দুধটুকু খান, তাহা হইলে আপনি শরীরে বল পাইবেন।

আরও অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল কাটিয়া গেল, বালিকার দেহে বল আসিল এবং সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল এবং তাহার সঙ্গিনীগণকে পরোক্ষে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কোথায়? আমার কি হইয়াছিল, আর ইনিই বা কে?

সঙ্গিনীগণ বলিল, না ভাই, সুহাস, তোমার বিশেষ কিছুত হয় নাই, তবে তুমি ফুটন্ত পদ্ম ফুল তুলিতে গিয়া বেশী জলে পড়িয়া গিয়াছিলে। আমরা চীৎকার করিয়া উঠায়, উঁনি আমাদের নিকট আসেন এবং আমাদের ব্যাপার শুনিবামাত্র জলে ডুব দিয়া তোমাকে জল হইতে তুলিয়াছেন। বয়স্যাগণের মধ্যে কুমুদিনী নামধেয়া একজন বয়োজ্যেষ্ঠা অগ্রসর হইয়া বলিল এস ভাই, আমরা উঁহার পরিচয় লই, এই বলিয়া কুমুদিনী যতীনকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহাশয় আপনি অতি সজ্জন।



"পুষ্করিণী তীরে শায়িতা সংজ্ঞা রহিতা সুহাসিনীকে যতীন উত্তরীয় দ্বারা বাতাস দিতেছে"—৪ পৃষ্ঠা

U. RAY & SONS.

আমরা আপনার অপরিচিতা তথাপি আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের বন্ধুর প্রাণদান করিয়া আমাদের যে উপকার করিলেন, তাহা আমরা জন্মেও ভুলিব না। আমরা আপনার নিকট চিরবাধিত হইয়া রহিলাম।

যতীন কথার উত্তর দিতে অক্ষম হইলেন। একবার আকাশের দিকে তাকাইলেন, বোধ হইল, ভগবানকে মনে মনে স্মরণ করিলেন এবং নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতে সফল হওয়ায়, এক অভূতপূর্ব্ব আত্মসুখে তাঁহার মুখে এক আনন্দের ভাব ফুটিয়া উঠিল। পরক্ষণেই বলিলেন, দেখুন, আমার দ্বারায় আপনাদের যদি কোন উপকার হইয়া থাকে, তাহাতে আমার কোন গৌরবের কথা নাই, ইহা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ; আর যদি আমি সম্মুখে কাহারও বিপদ দেখিয়া আমার যথাসাধ্য সাহায্যদানে অক্ষম হই, তাহা হইলে আমি ভগবানের নিকট দোষী হইব।

যতীন যে সময় এই কথা বলিতেছিলেন, সুহাসিনী একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল এবং তাহার কথা শেষ না হইতে হইতেই যতীনের দৃষ্টি সুহাসের দিকে পড়ায়, চারি চক্ষে মিলন হইল। যতীন একটু অন্যমনস্ক হইলেন এবং কি জানি, সুহাসের মুখ লাল হইয়া উঠিল ও সে মাটিরদিকে চাহিয়া ভিজা কাপড়ের আঁচল নিঙড়াইতে লাগিল। নিমেষের মধ্যে এই ব্যাপার ঘটিয়া গেল ; কিন্তু পাঠক পাঠিকার মত কোন পাকা লোক ঘটনাস্থলে অনুপস্থিত থাকায়, কেহ তাহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিল না এবং যতীন ও সুহাস জেরার দায় হইতে অব্যাহতি পাইল।

কুমুদিনী তাহার সহচরী সুহাসকে পরোক্ষে বলিল, দেখ ভাই, ইনি বড় ভাল। ইনি যদি তোর বর হন ত, বেশ হয়।

সুহাস কোন কথা কহিতে পারিল না, কেবল তাহাকে একটি চিমটি কাটিল এবং ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

যতীনও ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। তাহার মনে হইতেছিল, আহা, বালিকার দেহের গঠন কি সুন্দর, বর্ণ চাঁপা ফুলের ন্যায়, চক্ষু দুইটি স্বচ্ছ সরোবরে যেন দুইটি পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে, বালিকার বয়স অনুমান বার তের বৎসর হইবে, কিন্তু দেহের লাবণ্য যেন উথলিয়া পড়িতেছে।

অবশ্য সুহাস সুন্দরী বটে, কিন্তু যতীনের চক্ষে সুহাসের সকলি সুন্দর বোধ হইতেছিল, কেন হইতেছিল, ইহার সমস্যা পূরণ পাকা পাঠক পাঠিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া করিবেন, এবং নিশ্চয়ই বলিবেন "ভালবাসার চক্ষে ভালবাসার লোকের সকলই সুন্দর দেখায়।"

যতীন কুমুদিনীকে জিজ্ঞাসিলেন—আপনার বন্ধুর নাম ও পরিচয় জানিতে পারি কি?

কুমুদিনী। আপনি ওরকম কথা বলিয়া আমাদিগকে লজ্জা দিতেছেন কেন? আমার বন্ধুর নাম সুহাসিনী, পিতার নাম ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এখন শুনিলেন ত? সে যাহা হউক, আপনি ত আর আমাদের নাম ধাম চাহেন না?

যতীন থতমত খাইয়া বলিলেন—না তা নয়, না তা নয়, আপনাদেরও নাম বলুন না।

সুহাস কুমুদিনীকে টিপিয়া বলিল, তুই বড় দুষ্টু। এখন ভাই ওঁর পরিচয় এইবার জিজ্ঞাসা করিয়া নে না।

কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়ের নাম ও বাড়ী কোথায় আমাদের বলিবেন কি? না, সুহাস জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন?

যতীন। অবশ্য আপনারা জানিতে পারেন; আমার নাম শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষাল, বাড়ী বৈদ্যবাটী, পিতার নাম শ্রীভজহরি ঘোষাল।

উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইয়া কিছুকাল চুপ করিয়া রহিল। কেন, তাহা কে বলিতে পারে? তবে গ্রন্থকারের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই বোঝায় যে, তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ের মধ্যে আশারূপ আলোকের ক্ষীণ জ্যোতিঃ কি জানি কি এক অজানিত ভাবে দুটি হৃদয় আলোকিত করিয়া তুলিল।

পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারের পর প্রায় আধ ঘণ্টা অতীত হইয়াছে সহসা যতীনের নিদ্রিত ভ্রাতার কথা মনে হওয়ায়, যতীন বালিকাগুলিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, আপনারা এখন বাড়ী ফিরিয়া যান, আমিও আসি।

কুমুদিনী। আমরা যাইতেছি, আপনি আমাদের ভুলিবেন না।

যতীন। সে কি কখনও হইতে পারে! আমি আমার মামার বাড়ী যাইতে হইলেই এই ধার দিয়া যাই, আবার দেখা হইবে।

এই বলিয়া যতীন বিষণ্ণ বদনে তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সেই বটবৃক্ষের তলায় আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন, নরেন্দ্র তখনও ঘুমাইতেছেন। যতীন তাহার পার্শ্বে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন; আহা! ভগবানের সৃষ্টির কি বিচিত্র শোভা, তিনি কত রকম জীব ও পশু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের আহার যোগাইতেছেন। তাহার কত রকম নামই যে দিয়াছেন, তাহার কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে পারা যায় না। পরক্ষণেই সুহাসের কথা মনে হওয়ায় ভাবিলেন, বালিকাটির কি সুন্দর নাম ও কি সুন্দর গঠন ও কিশোর বয়স, যেন নব প্রস্ফুটিত চম্পক ফুল, তাহার কি সলজ্জভাব ও সরল কটাক্ষ, সেই কটাক্ষে মনের ভাব সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হইতেছিল ইত্যাদি। এমন সময় বৃক্ষোপরি হইতে পাপিয়া ডাকিয়া উঠিল, তাহার স্বরে নরেন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে দেখিল, তাহার ভাই যতীন তাহার পার্শ্বে বসিয়া

অন্যমনে কি ভাবিতেছে। ইহা দেখিয়া, সে যতীনকে জিজ্ঞাসা করিল, ভাই যতীন, তুমি কি কোথাও গিয়াছিলে? আর তোমার এত দেরি হইল কেন?

যতীন দাদার এইরূপ হঠাৎ প্রশ্নে একটু থতমত খাইয়া বলিল, দাদা, আমি এইখানে ভাল পুষ্করিণীর সন্ধানে বেড়াইতে বেড়াইতে রাস্তা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তাই আমার আসিতে এত দেরি হইল। দাদা, তোমার কি কোন অসুখ করিয়াছে যে, তুমি ঘুমাইতেছিলে?

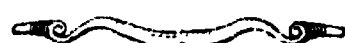
নরেন্দ্র। না ভাই, আমার শরীর ভাল আছে, তবে পথশ্রম অধিক হওয়ায় কিছু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম তাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছি।

এদিকে পশ্চিম গগনে সূর্য্যদেব প্রায় অস্ত গমনোন্মুখ, পক্ষীসব নিজ নিজ বাসায় ফিরিয়া যাইতেছে, সমস্ত ধরণী যেন সমস্ত দিনের পর বিশ্রাম করিতে যাইতেছেন। ইহা দেখিয়া নরেন্দ্র বলিল, যতীন সন্ধ্যা হইয়া অসিল, ভাই বাটীতে বাবা ও মা বোধ হয় আমাদের জন্য বড়ই ভাবিতেছেন, চল, আর বেশী দেরি করা উচিত নয়, এই বলিয়া উভয়ে সত্বর গৃহাভিমুখে চলিল।





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।





বৈদ্যবাটী গ্রামে একঘর ব্রাহ্মণ বাস করিত। বাটীর কর্ত্তার নাম ভজহরি ঘোষাল, কিন্তু গ্রামস্থ লোকে তাঁহাকে ঘোষাল ঠাকুর বলিয়াই জানিত। তিনি আর অপর কেহ নহেন পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত নরেন্দ্র ও যতীনের পিতা। তাঁহার বসতবাটী খানি গ্রামের প্রান্তভাগে অবস্থিত। কয়েকখানি পর্ণ কুটীরের সমষ্টি মাত্র। বাড়ী খানি পর্ণকুটীর হইলে কি হয়, তাহা এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং গৃহস্থের উপযোগী আসবাব-পত্র সাজ সরঞ্জাম আদি এমন যথাস্থানে এবং রুচিপূর্ব্বক সন্নিবেশিত যে, তাহা দেখিলেই মা লক্ষীর আবাসস্থান বলিয়া স্পষ্টই অনুমিত হয়। এবং ইহা হইতেই বাটীর কর্ত্তা, কর্ত্রীঠাকুরাণি ও অন্যান্য পরিবারগণের গৃহকর্ম্ম নিপুণতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণের পরিবার-বর্গ বড় বেশী নহে। নরেন্দ্র ও যতীন নামক দুইটি পুত্র, একটী অবিবাহিতা কন্যা, নাম সরলা; কিন্তু লোকে তাহাকে ছোট পুঁটি বলিয়া ডাকিত। ঘোষাল গৃহিনী প্রমদাসুন্দরী ও পুত্রবধূ (নরেন্দ্রের

স্ত্রী) বিমলা। যতীনের এখনও বিবাহ হয় নাই, তবে কথাবার্ত্তা হইতেছে মাত্র। ঘোষাল সংসারে 'লক্ষ্মী শ্রী বর্ত্তমান থাকায় কর্ত্তা ও কর্ত্রীঠাকুরাণী' পুত্র পুত্রবধূ, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী, ভ্রাতৃজায়া ও দেবর পরস্পর পরস্পরের প্রতি সম্বন্ধ উপযোগী ও বয়সানুযায়ী স্নেহ ও ভক্তিপূর্ণ ব্যবহারে এমন একটা কমনীয়তা ও আন্তরিকতা পরিলক্ষিত হইত যে, তাহা বর্ত্তমান হিন্দু সংসারে একেবারেই দৃষ্ট হয় না।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, এখনও যতীন ও নরেন্দ্র বাড়ীতে আসে নাই, তাহার মাতা বড়ই ভাবিত হইলেন। তিনি তাহার স্বামিকে বলিলেন, হ্যাঁগা, একবার একটু এগিয়ে দেখিলে হয় না? ছেলেরা কোথায় গেল, এখনও বাড়ীতে আসিল না কেন?

ইহাতে ভজহরি বাবু বলিলেন, তাইত, ছেলেরা কেন এখনও বাড়ী আসিল না। মন কিছু চঞ্চল হইলেও তাহা গোপন করিয়া বলিলেন, যাহা হউক, তুমি ভাবিত হইও না, আমি শীঘ্র দেখিতেছি। এই বলিয়া তিনি রাস্তায় বাহির হইলেন, রাস্তায় বাহির হইয়া অধিক দুর যাইতে না যাইতে দেখিলেন যে, যতীন ও নরেন্দ্র অতি দ্রুতপদে আসিতেছে; দেখিয়া তাহার মনে বড়ই আহ্লাদ হইল; কিন্তু পরক্ষণেই এক অজানিত আশঙ্কায় তাঁহার মন বড়ই ভাবিত হইতে লাগিল, মনে মনে করিলেন, তাহারা এত দ্রুতপদে আসিতেছে কেন, কোনরূপ বিপদগ্রস্থ হয় নাই ত।

এদিকে যতীন নরেন্দ্র দেখিল যে তাহাদের পিতা তাহাদের দিকেই আসিতেছেন—দেখিয়া তাহাদের প্রাণে বড়ই ভয় হইল, বোধ হয় বাটীতে কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, কিম্বা আমাদের আসিতে বিলম্ব হওয়ায়, পিতা আমাদের খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। যাহা

হউক কিছু দূর আসিয়া তাহারা উভয়ে পিতার সহিত মিলিত হইল, পিতা তাহার সন্তান দুটীকে দেখিয়া যার পর নাই সুখী হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের বৈকালে ফিরিবার কথা, তোমাদের এত দেরী হইল কেন? রাস্তায় কোনরূপ বিপদ ঘটে নাই ত?

নরেন্দ্র। না বাবা আমাদের কোন বিপদ ঘটে নাই, তবে মামারা ছাড়িলেন না, বলিলেন, অনেক দিন পরে আসিয়াছ, আমি তোমাদিগকে না খাওয়াইয়া ছাড়িব না, তাই আমাদের আসিতে এত দেরী হইল।

অবশেষে তাহারা সকলে তাহাদের বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়া ঘোষাল গৃহিণীর আর আহ্লাদের সীমা রহিল না, যতীন ও নরেনকে জিজ্ঞাসিল- হ্যাঁ বাবা নরু, যতী হ্যাঁরে তোদের বৈকালে মামার বাড়ী থেকে আসিবার কথা, তা এত দেরী হ'ল কেন? তখন তাঁহার স্বামী আদ্যোপান্ত সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, যাও এখন তোমার ছেলে দুটীকে ত পাইয়াছ, —আর ভাবনা কেন, খাবারের উদ্যোগ দেখগে।

রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকা, ঘোষাল সংসারে রাত্রের আহারাদি শেষ হইয়া গিয়াছে। রান্নাঘর পরিষ্কার ও উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি মাজিয়া ধুইয়া বিমলা ও ছোট পুঁটী কাপড় কাচিয়া অপর কাপড় পরিয়া পান খাইতে খাইতে বিমলা তাহার শয়ন ঘরে স্বামী নরেন্দ্রের নিকট এবং ছোট পুঁটী তাহার মায়ের কাছে গেল। আসুন কৌতুহলী পাঠক পাঠিকা একবার হিন্দু-কুলবধূর ব্রীড়া সমন্বিত সঙ্কোচপূর্ণ অথচ গভীর প্রণয়পুরিত কথোপকথন অভিসারে শ্রবণ করি!

আহারাদির পর নরেন্দ্র পিতৃসন্নিধানে গিয়া বসিলেন, ভজহরি বাবু তখন তাম্রকুট সেবনে মগ্ন হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। নরেন্দ্রকে দেখিয়া বলিলেন, নরেন্দ্র, বাবা আজ সমস্ত দিন তোমাদের বড়ই কষ্টে গিয়াছে, অতএব শীঘ্র শয়ন করিয়া সুস্থ হও।

নরেন্দ্রও পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আপনার শয়নঘরে গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার প্রিয়তমা-পত্নী বিমলাসুন্দরী. তখনও ঘরে আইসেন নাই। সেই জন্য তিনি বিছানার সন্নিকট একখানি টুলে বসিয়া ও কাপড়ের দেরাজে হেলান দিয়া একখানি পুস্তক খুলিয়া বসিলেন, বসিলেন মাত্র! কিন্তু পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছেন না। কেন? আপনারা জানেন কি? প্রণয়িনীর আগমন প্রতীক্ষায় এক একবার দ্বারের দিকে দেখিতেছেন, আর এক একবার দেরাজের উপরিস্থিত টাইম্‌পিসের দিকে লক্ষ্য করিতেছেন। ঘড়ি কাহারও কথা শুনে না, আপনার কাজ টিক্ টিক্ করিয়া সারিয়া যাইতেছে; নরেন্দ্রের একটু তন্দ্রা আসিবার উদ্যোগ হইয়াছে, এমন সময় অবগুণ্ঠনবতী বিমলা অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। পরে নরেন্দ্রের নিকট আস্তে আস্তে গিয়া দাঁড়াইল, মাথার কাপড় একটু তুলিয়া অনিমেষ-নয়নে হিন্দু পতিব্রতা স্ত্রীর একমাত্র দেবতা নরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল, তাঁহাকে একটু তন্দ্রাভিভূত দেখিয়া আলো সরাইয়া পাখা লইয়া আস্তে আস্তে হাওয়া করিতে লাগিল। শয়ন ঘরের পার্শ্বে . শৃগালাদি কোন জন্তুর বাটীর প্রাঙ্গনে চোরের মত প্রবেশ করিবার চেষ্টায় নিকটস্থ ছাইএর গাদায় শায়িত গৃহ-পালিত সারমেয়ের হঠাৎ বিকট চীৎকারে নরেন্দ্রের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, চক্ষু মুছিয়া চাহিতেই তাঁহার হৃদয় সরোবরের একমাত্র

পদ্মকলিকা বিমলাসুন্দরীকে মিটিমিটি হাসিতে দেখিয়া বলিলেন, বিমলা, হাসিতেছ কেন?

বিমলা। তোমাকে দেখিয়া।

নরেন্দ্র। আমাকে কি কখনও দেখ নাই? আর আমাকে দেখিলেই কেন তোমার হাসি আসে?

বিমলা। তোমাকে দেখিব না কেন? সেই বিবাহ রাত্রে বরণের সময় শুভদৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়াত দেখিয়া আসিতেছি; কিন্তু তোমাকে দেখিয়া কি আশা মেটে? যতই দেখি ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়, তোমাকে সুধু দেখিয়া মন কেমন হইয়া যায় এবং দেখিতে দেখিতে কি জানি কেন হাসিয়া ফেলি। তুমি এমনই নিষ্ঠুর যে আমার হাসিটুকুও বুঝি তোমার ভাল লাগে না। বেশ মানুষ যা হোক!

নরেন্দ্র বিমলার হাতখানি ধরিয়া আস্তে আস্তে কাছে টানিয়া আনিয়া বাহুযুগল দ্বারা বিমলার স্বল্পস্পন্দিত দেহখানি আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার বক্ষোপরি স্থাপিত বিমলার মুদ্রিত নয়নে ও ঈষৎ কম্পিত ওষ্ঠে ও কপোলে আবেগভরে কয়েকটি চুম্বন বসাইয়া দিলেন, পরে নরেন জিজ্ঞাসা করিলেন—মা শুইতে গিয়াছেন কি?

বিমলা। হ্যাঁ, আমি তাঁহার পান ও দোক্তা দিয়া আসিলাম; তিনি শুইবার ঘরে যাওয়ায় আমি এখানে আসিয়াছি।

স্বামি স্ত্রীর অনেক বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। যতীনের কথা উত্থাপিত হওয়ায় নরেন্দ্র কহিল দেখ, বিমল, তুমি একটি কাজ করিতে পারিবে? আমার মনে হয় তোমার দ্বারাই এ কার্য্যটি নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হয়।

বিমলা। তুমি এত কিন্তু হইয়া কথা কহিতেছ কেন? পৃথিবীতে এমন কি কার্য্য আছে যাহা স্বামীর আদেশে স্ত্রী না করিতে পারে? এখন বল দেখি শুনি, কি হুকুম তামিল করিতে হইবে।

নরেন্দ্র। দেখ—আজ দুপুর বেলা মামার বাড়ী হইতে আসিবার সময় আমরা রৌদ্রে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়ি। এক গাছের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে আমি ঘুমাইয়া পড়ি। যতীনের তৃষ্ণা পাইয়াছিল—শুনিলাম, ভাল পুষ্করিণীর সন্ধানে যাইয়া পথ ভুলিয়া যায়, পরে আমার কাছে আসিয়া আমাকে হাওয়া করিতেছে, এমন সময় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। যতীনকে পথ ভুলার কথা বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করায়, যতীন যেন একটু থতমত খাইয়া গেল এবং তাহাঁকে কিছু অন্যমনস্ক ভাব দেখিলাম—বাড়ীতে আসিয়াও তাহার কেমন কেমন অন্যমনস্ক ভাব দেখিলাম। আমার মনে একটু খট্‌কা লাগিল যে, ইহার মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা যতীন আমার সমক্ষে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে; কারণ যতীন ত আমার তেমন ভাই নয় যে, আমার কাছে সে অপ্রকাশ রাখিবে। তাই আমার মনে হইতেছিল যে, বিমলা গোয়েন্দা লাগাইলে তাহার মনের কথা সকলই বাহির হইয়া পড়িবে।

বিমলা। আচ্ছা, ঠাকুরপোকে জিজ্ঞাসা করিব। আমায় সে মার পেটের বড় বোনের মত ভক্তি ও যত্ন করে। এখন আমার হাত যশ।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর দম্পতিযুগল ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন মধ্যাহ্নে আহারাদির পর নরেন্দ্র পাড়ায় একজনের বাটীতে একটু দরকারে গেল। ভজহরি বাবু চণ্ডীমণ্ডপে একটু বিশ্রামের চেষ্টায় গিয়াছেন। ছোট পুঁটীকে লইয়া ঘোষাল গৃহিণী ঘরের মেঝেয় শয়ন করিয়াছেন। এমন সময় যতীন "মা একটু খাবার জল দাও ত" বলিয়া দাওয়ায় উঠিল। ঘোষাল গৃহিণী পুত্রবধূ বিমলাকে ডাকিলেন, বৌমা, যতীনকে জালা থেকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা খাবার জল দিয়া যাওনা মা। আমার ভাত খাওয়া কাপড়, আমি আর জলের জালা ছুঁইব না।

বিমলা তাড়াতাড়ি যতীনকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া এক গ্লাস জল খাইতে দিলেন।

যতীন জল খাইতে খাইতে বলিল—বৌদিদি, জলটি বেশ ঠাণ্ডাত আর একটু দাওনা বৌদিদি। বিমলা আর একটু ঢালিতে ঢালিতে হাসিয়া বলিলেন—ঠাকুরপো, শুনিলাম কালও এই সময়ে তোমার বেজায় পথ হাঁটিয়া জল তেষ্টা পাইয়াছিল—ভাল পুকুরের সন্ধানে গিয়া আবার পথ হারাইয়াছিলে নাকি?

যতীন। হ্যাঁ গো বৌদিদি। একটি ভাল পুকুর দেখিলাম পরে জল খাইয়া দাদার কাছে আসিব মনে করিতেছি, এমন সময়—————না থাক, সে কথা—বৌদিদি একটা পান দেবে?

বিমলা। কেন দেব না ভাই—কিন্তু কি বলিতে যাইতেছিলে, তা না বলিলে পাইবে না। আমি কি ভাই শুনিতে পাই না—যদি বলিবে না, তবে কথা তুলিলে কেন?

বৌদিদির এই অভিমানপূর্ণ একটু মিঠেকড়া তিরস্কারে যতীনের মন উথলিয়া উঠিল, পরে ধীর সতর্কতার সহিত বলিল—সে এমন কিছু নয়, এই বলিয়া একটু যথাযথ একটু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অদল বদল করিয়া বলিতে গেল; কিন্তু সত্য কথা গোপনে অনভ্যস্ত থাকায় ও বৌদিদি-রূপ সদর জেলার ফৌজদারী মকদ্দমায় নিযুক্ত আসামী পক্ষ সমর্থন-কারী বিলাত প্রত্যাগত নামজাদা কৌন্সিলির জেরায় কাবু হইয়া পড়িল, এবং অবশেষে সমস্ত কথা প্রকাশ হওয়ায় যতীনের কি অজানিত আশঙ্কায় চোখ মুখ একটু লাল হইয়া উঠিল এবং একটু সঙ্কোচভাবে অভিভূত হইল। তাহা দেখিয়া বৌদিদি যতীনকে একটু প্রকৃতিস্থ করিবার মানসে বলিলেন, আহা সে মেয়েটী কাদের গো? বেঁচে গ্যাছে ত?

যতীন। হাঁ সেই জন্যইত আমার এত দেরী হইল। তাহার মুখে চোখে জল দিয়া তাহার চেতনা আনাইয়া বাটী পাঠাইয়া দিয়া তবে আসিয়াছি।

বৌদিদি। হাঁ, বেশ করেছ, তুমি তোমার কর্ত্তব্য কাজই করিয়াছ এবং এই পৃথিবীতে কেবল পরের উপকার করাই দরকার আর ও যখন তোমার হাতেই আসিয়া পড়িয়াছিল তখনই আমি বুঝিয়াছি যে তোমার দ্বারা তাহার ভাল বই মন্দ হইবে না। তা বেশ কাজই করিয়াছ, এখন বল দেখি ভাই মেয়েটী কেমন দেখিতে আর তাহার বয়স কত ?

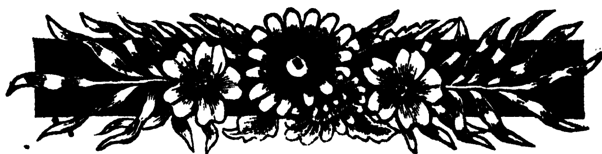
যতীন। মেয়েটী দেখিতে বেশ সুন্দর এবং বয়স অনুমান ১২ বৎসর হইবে।

বিমলা। ঠাকুরপো, তোমার ওই রকম একটী কনের সহিত—কেন ওই মেয়েটী সহিত—যদি বিবাহ হয় ত বেশ হয়, কেমন না ?

যতীন লজ্জায় অভিভূত হইল মুখে বলিল—বৌদিদি বড় দুষ্ট—কিন্তু মনে মনে বৌদিদির মুখে ফুল-চন্দন পড়ার ব্যবস্থা যে না করিয়াছিল এমন নহে।

বৌদিদিও বেশ বুঝিতে পারিল ইহাতে যতীনের সম্মতি ছাড়া অমত নাই।





তৃতীয় পরিচ্ছেদ।



পরদিন প্রাতে নরেন্দ্র তাহার পিতামাতাকে বলিল যে, মামারা বল্‌ছিলেন যে, তাঁহারা ছোট পুঁটির বিবাহের ভাল একটী সম্বন্ধ খুঁজিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদেরই বাড়ীর নিকটে, পাত্রটী খুব ভাল এবং পয়সাও আছে। যদি আপনাদের পছন্দ হয়, তাহা হইলে মামাদের খবর দিতে বলিয়াছেন।

ইহা শুনিয়া ঘোষাল গৃহিণী স্বামীকে বলিলেন—কি গো, ভাবছ কি? মেয়েটী যে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে, আর কত দিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে।

ভজহরি। ভাবিব আর কি? ও সম্বন্ধ যখন তোমার ভায়েরা আনিয়াছেন, তখন আর কোন কথাই নাই। তবে পাত্রটীর সম্বন্ধে একবার এবং দেনা পাওনা সম্বন্ধে একটু ভাল করিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ আমি গরীব লোক—অবস্থার অতিরিক্ত দিতে ত পারিব না।

গৃহিণী। হ্যাঁগা, তোমার মেয়ে আগে, না পয়সা আগে ? ছেলেটী দেখিতে শুনিতে ভাল ও সচ্চরিত্র হইলে এবং ভাত কাপড়ের স্বচ্ছলতা ও মাথা গুঁজিবার নিজের একটু কুঁড়ে থাকিলে দেওয়া থোয়ার বিষয়ে বিশেষ আজকালের বাজারে—কড়াকড়ি করিলে ত চলিবে না। তবে উহার মধ্যে ন্যায্য গণ্ডা যা চাহিবে তাহাই দিতে হইবে। আমাদের যোগাড়ের টাকাতে যদি না সংকুলান হয়, তবে বেশী '২০০।১০০ টাকার জন্য তোমায় বিশেষ ভাবিতে হইবে না—আমার যে ২।১ খানা গহনা' আছে তাহা দিলেই বোধ হয় চলিতে পারিবে।

ভজহরি। আচ্ছা, সে এখন পরের কথা ; আগে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সম্বন্ধটা ঠিক হইয়া যাক, তার পর ওসব কথা হইবে। আচ্ছা নরেন্দ্র, তুমি তোমার মামাকে বলিও যে, বাবা বলিলেন, ও আর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার কিছু দরকার নাই ; সম্বন্ধ যখন আপনি আনিয়াছেন, তখন আপনি ও আমার মাতা যাহা ভাল বিবেচনা বোধ করিবেন তাহাই করিবেন, কেবল সময় থাকিতে তাঁহাকে খবর দেন যেন, তিনি এধারকার সব উদ্যোগ করিতে পারেন। আরও তোমার মামাকে বলিও যে তাঁহারা কি চান আমায় যেন শীঘ্রই জানান।

প্রমদা। চল এখন ভাত খাওগে, বেলা হইয়া গিয়াছে। নরেন্দ্র এস বাবা, তুমিও খাবে এস, আবার তোমায় আজ মামার বাড়ী যেতে হ'বে।

নরেন্দ্র ভাত খাইয়া একটু বিশ্রামের পর তাহার মামার বাটীর অভিমুখে চলিল—প্রায় দুই ঘণ্টা কাল চলিয়া আসিয়া সে তাহার মামার বাড়ী পৌঁছিল।

তাহার বড় মামা তাহাকে অসময়ে হঠাৎ আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল—কি হে নরেন্দ্র, হঠাৎ এমন সময়ে যে, খবর ভাল ত ?

নরেন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ, খবর সব ভাল, তবে বাবা আপনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পুঁটির বিবাহের সম্বন্ধের বিষয় বাবার ও মার মত আছে, তাঁহারা বলিলেন যে, ও আমরা আর কি বলিব, তোমার মামারা যাহা ভাল বিবেচনা করিবেন তাহাই হইবে, তবে আমাদের একটু আগে যেন পাকা খবরটা দেওয়া হয়, আর দেনা পাওনা সম্বন্ধে বলিও যে, আমরা গরীব মানুষ যেন তোমার মামারা বিবেচনা করিয়া যাহা ভাল হয় তাঁহাদের বলেন।

মামা। ও আর বেশী কথা কি। ভোলানাথ বাবু আমার বন্ধু, আমি তাহাকে সব ভাল করিয়া বলিব, তবে তুমি এখন একবার বাড়ীর ভিতর যাও গিয়া একটু জলটল খাও।

নরেন্দ্র। না মামা, আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে, আজ আমি যাই, আর একদিন আসিব।

নরেন্দ্র বাটীর অভিমুখে ফিরিল।

কিছুক্ষণ পরেই তাহার মামা বাটীর নিকটেই ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

ভোলানাথ বাবু যদু বাবুকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

যদু বাবু। খবর ভাল, তোমার ছেলের সহিত আমার ভাগিনেয়ীর বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া আসিয়াছি, এখন বিবাহ দিয়া অনুরোধ রাখিতে হইবে। এখন কি বলিবে বল ?

ভোলানাথ বাবু। ও আর আমার কি মত, তুমি যখন এর মধ্যে আছ, তখন তুমি যাহা ভাল বিবেচনা করিবে তাহাই হইবে, তবে কি জান, কেবল ছেলের গর্ভধারিণীর মতটা হইলেই হয়—আচ্ছা, আমি এ বিষয়ে তাঁকে বলিব এবং তাঁর কি মত তোমাকে জানাইব।

মধ্যাহ্নকাল; আহার সমাপনান্তে ভোলানাথ বাবু স্বকীয় বিশাল বপুখানি একখানি শীতল পাটীর উপর ঢালিয়া দিয়া তাম্রকুট সেবনের মৌজ অনুভব করিতেছিলেন।

এমন সময় তাঁহার স্ত্রী পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হঁ্যাগা, ওবাড়ীর যদুবাবু আসিয়াছিলেন কেন?

ভোলানাথ বাবু। তাঁহার একটী ভাগিনেয়ী আছে, তার সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ের জন্য।

রাজবালা। মেয়েটী কেমন? দেনা পাওনা কি দিবে বলিলে?

ভোলানাথ বাবু। মেয়েটী বেশ, যেন পরী—তবে তাঁরা গৃহস্থ মানুষ, তত দিতে থুতে পারবেন না, তবে তুমি যাহা বলবে আমি তাহাই বলিব।

রাজবালা। আমার ছেলে ত যে সে ছেলে নয়, আমার দুটো পাশ করা ছেলে, আমি কি অমনি ছেড়ে দেব. তার বিয়েতে এই সব চাই—দেড় হাজার টাকা নগদ, খাট, বিছানা, একশ ভরি সোণা, ঘড়ির চেন, হীরার আংটী। যদি দিতে পারে তবে মেয়ে আন্‌ব, আর নয়ত ছেলের বিয়ে দেব না। আর মেয়ে আমি নিজে দেখবো, আমার যদি পছন্দ হয়, তাহা হইলে অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি বিয়ে দিব।

ভোলানাথ বাবু। ও বাবা, তুমি যে একেবারে এক ছেলের বিয়ে দিয়ে রাতারাতি বড় মানুষ হতে চাচ্চ দেখছি। আচ্ছা গিন্নী, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি এখন তোমার ছেলের বিবাহ বলিয়া বলিতেছ যে আমার এত চাই, এর কমে হবে না; কিন্তু এটা মনেতে ভাবিলেও না যে, হাঁ, আমারও একটা মেয়ে আছে, আমাকেও দুই মাস পরে তার বিবাহ দিতে হবে। যেটা রয় সয় সেইটা বল্‌লেই ভাল হয় না? তোমায় ভগবান আর যে কেন ছেলে দেন নাই, তাহা

এখন বুঝছি, ভালই করিয়াছিলেন, কেন না, তোমার একটী ছেলের বিয়েতেই তার ভাবী শ্বশুর পথে বস্‌বেন।

রাজবালা। হাঁগো হ্যাঁ, তোমার কেবল ওই কথা—আচ্ছা, এর কমে আমি কখনই ছেলের বিয়ে দেব না—হাজার টাকা নগদ, খাট বিছানা, ঘাট ভরি সোণা, ঘড়ির চেন, হীরার আংটী। কেমন গো, এইবার বোধ হয় পছন্দ হয়েছে?

ভোলানাথ বাবু। আচ্ছা, এর কমে তোমার ছেলের ত বিয়ে দেওয়া হবে না।

ভোলানাথ বাবু ও গিন্নীর কল্পিত আকাশ কুসুমে কথঞ্চিৎ আস্থা যে না দিলেন, এমন নহে, কিন্তু হংসের স্বর্ণ ডিম্ব প্রসবের ব্যাপার মনে হওয়ায় বড়ই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন; তখন তাম্রকূট সেবনরূপ চিত্ত প্রশান্তকারী বামের (Balm) নিকট আত্ম সমর্পণ করিলেন। রাজবালাও সুখস্বপ্নে বিভোরা হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

সময় কাহারও হাত ধরা নয়—মানুষ নিমকহারাম হইতে পারে, কিন্তু সেই মানুষ নির্ম্মিত ঘটিকাযন্ত্র কখনও বেইমান হইতে পারে না; ক্রমশঃ এক, দুই, তিন করিয়া চারিটা বাজিল, ভোলানাথ বাবু রাজবালার ঘুম ভাঙ্গাইতে সাহসী হইলেন না, যদিও রাজবালার হুকুম হুজুরে তামিল করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে রাজবালার ঘুম আপনি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাঁহার চিত্ত কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল; রাজবালা হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—যদুবাবুর কাছে যাবে কখন? এধারে বেলা গেল যে। আমি মরে ঘুমাইয়াছিলাম—তুমি ত জাগিয়াছিলে—আমাকে কি ডাকিয়া দিতে নাই—কত কাজ সংসারের পড়িয়া রহিয়াছে।

ভোলানাথ বাবু। হাঁ, বেলা শেষ হয়ে এল, আমিও কাপড় ছেড়ে যদুবাবুর কাছে এখনি যাইতেছি।

যদুবাবু কাপড় পরিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ভোলানাথ বাবু যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া যদু বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হে ভায়া, এমন সময়ে যে, কি খবর ?

ভোলানাথ বাবু। না তেমন কিছু নয়, তবে তোমার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌তে এলাম। তা থাক এখন, তুমি বাহির হইতেছ, আমি আর এক সময় আসিব এখন।

যদুবাবু। তা হোগ, তুমি বল না হে তোমার খবর কি ? আমার কাছে আবার এত ভারিক্যি ভাব কেন বল ?

ভোলানাথ বাবু। তা নয় তবে তোমার ভাগিনেয়ীর বিবাহ সম্বন্ধে দেনা পাওনা বিষয় যা বলিব বলিয়াছিলাম, তাই বলতে আসিয়াছি।

যদুবাবু। এই কথা ; এর জন্যে আবার বলিতেছিলে যে, আর এক সময়ে আসিব। কেন, তুমি কি আমার পর ? আমরা উভয়ে উভয়ের বন্ধু, আমাদের আবার সময়ের সুবিধা ও অসুবিধা কি ? যার যখন দরকার তখনি ডাকিয়া পাঠাইবে, এই ত হ'ল বন্ধুর কাজ। নাও, এখন বল তোমার দেনা পাওনার বিষয় বল।

ভোলানাথ। ভাই আমি গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে বলে, আমার এই চাই—হাজার টাকা নগদ, খাট বিছানা, ষাট ভরি সোণা, ঘড়ির চেন ও হীরার আংটী, এর কমে আমি ছেলের বিয়ে দেব না। তা ভাই তুমি একবার তোমার ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিও এবং তাঁহারা কি জবাব দেন, তাহা পরে আমায় বলিও, কেমন ?

যদু বাবু। ভাই ভোলানাথ, আমার অনুমান যে, তাঁরা এত দিতে পারবেন না, কারণ তাঁরা গরীব মানুষ, আবার একটী ছেলের বিয়ে দিতে

বাকী আছে, তবে তুমি যখন বলিতেছ, তা আমি কল্যই নরেন্দ্রকে ডাকাইয়া সব বলিব।

পরদিন প্রাতে যদুবাবু তাহার ভগ্নির বাটী বৈদ্যবাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার ভগ্নিকে সব বলিলেন যে, বরেরা এই এই চায়; তাহাতে তাহার ভগ্নি প্রমদা বলিল, বেশ ভাই, তোমার ঘোষাল মহাশয় আসিলে সমস্ত বলিয়া রাখিব এবং নরেন্দ্রদ্বারায় খবর পাঠাইব। উভয়ে বসিয়া আর নানাবিধ কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময়ে তথায় ভজহরি বাবু ও নরেন্দ্র উপস্থিত হইল। ভজহরি বাবু তাঁহার শ্যালক যদুকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাদের উভয়ে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং কি খবর জানিবার জন্য বড়ই আগ্রহ হইল এবং যদুকে জিজ্ঞাসিল, কি হে সম্বন্ধি বাবু, কি খবর? আজ যে আমাদের একেবারে বাদ দিয়া ভগ্নির কাছে উপস্থিত। যাহা হোক, তোমাদের বাটীর সব খবর ভাল ত? আজ যে এমন অসময়ে হঠাৎ উপস্থিত, ব্যাপার কি বল?

যদু। না, তেমন কিছু নয়, তবে খবর বড়ই ভাল, সেই জন্য আজ আপনাদের সহিত এ সময়ে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। এই আপনি আমাকে যে ভোলানাথ বাবুর ছেলের সহিত আমাদের ছোট পুঁটির সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা প্রায় এক রকমই সব ঠিক হইয়াছে, কেবল আপনার মতের অপেক্ষায় আছি, তাহারা এই এই চায়; এর কমে তাঁহারা বিবাহ দিবেন না। ভজহরি বাবু তাহা শুনিয়া একেবারে গালে হাত দিয়া বসিলেন, নরেন্দ্রও দাঁড়াইয়াছিল বসিয়া পড়িল, ইহা দেখিয়া প্রমদা বলিল, হ্যাঁগো তুমি যে একেবারে গালে হাত দিয়া বসিলে, যাহা হয় একটা জবাব দাও।

ভজহরি বাবু। তাইত গিন্নি, এ যে মেয়ের বিয়ে দেওয়া নয়, একেবারে গলায় পা দেওয়া। যাহা হউক, দেখ যদু, তুমি তাঁহাদিগকে বলিও যে, আচ্ছা আপনারা যাহা চাহিয়াছেন, তাহাই দিব এবং অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই নাগাইত যেন বিবাহের দিন ঠিক করা হয় ও একটু শীঘ্র যেন বিবাহটা দেওয়া হয়। কেমন প্রমদা ও নরেন্দ্র এই ত তোমাদের মত ?

নরেন্দ্র। ও যখন আপনি মা ও মামা আছেন, তখন আর আমার মত জিজ্ঞাসা করিবার বিশেষ দরকার নাই এবং আপনারা যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই করিবেন।





চতুর্থ পরিচ্ছেদ।





জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু মানব অনুজ্ঞায় পরিচালিত হয় না। ইহার পরিচালন কোন অলক্ষিত উচ্চ শক্তির—বিধাতৃ আদেশের—অপেক্ষা করে। ইহার মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু ধ্রুব সত্য বা শরীরীগণের অবশ্যম্ভাবী নিয়তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। কারণ, জন্ম হইলেই মৃত্যু একদিন না একদিন "কান টানিলে মাথা আসার" মত আসিবেই। কিন্তু বিবাহ বিষয়ে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। বিবাহরূপ পবিত্র বন্ধনে সম্মিলিত না হইয়াছেই বলুন, এরূপ মানব অথবা বিবাহরূপ যূপকাষ্ঠে বলি হয় নাই, এরূপ অনেক "ধেড়ে কার্ত্তিক" পৃথিবীস্থ সকল জাতীয়ের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, হিন্দুর উদ্বাহ কার্য্য এক অদ্ভুত ব্যাপার। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজন্ম বিভিন্ন উদ্দেশে পরিচালিত ক্ষুদ্র কিন্তু সরল মানব মনের চিরজন্মের মত একত্র সম্মিলন, ইহাতে স্বার্থের আবিলতা নাই—আমিত্বের অস্তিত্ব নাই। ইহা পাশ্চাত্য জাতীর কোর্টসিপ বা বিবাহ চুক্তি পত্রের পূর্ব্ব অনুরাগের "প্রথম চাউনিতেই

মাৎ” বা যুবক যুবতীর Love at the first sightএর ক্রমবিকাশ বা ফল নহে।

ঘোষাল ঠাকুরের কন্যা ছোট পুঁটির বিবাহের সমস্ত কথাবার্ত্তা দেনা পাওনা স্থির হইয়াছে—এখন শুভদিনে—দুই হাত এক হওয়া বাকী। সেই শুভদিনের কয়েক দিন আগে হইতেই উদ্যোগ পর্ব্ব চলিতেছিল —ক্রমশঃ সময়নেমির আবর্ত্তনে সেই দিন আসিয়া উপস্থিত হইল।

গত কল্য হইতেই বৈদ্যবাটী গ্রামে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে—কারণ, কাল শুভ গাত্র হরিদ্রা হইয়াছে। দুপুর বেলা আহারাদির পর মেয়ে মহলে এবং বৈকালে পুকুর ঘাটে পার্লিয়ামেণ্ট বা বড় মিটিং বসিয়া গিয়াছে—সে মিটিংএর বিবেচিত বা সমালোচিত বিষয়ের যথাযথ ধারাবাহিক বিবরণ সাধারণের সমক্ষে পেশ করা মাদৃশ অধমের ক্ষমতার অতীত—তবে তাহার আভাসমাত্র সহৃদয় পাঠক পাঠিকা কথঞ্চিৎ ক্ষমা ঘেন্না করিয়া জানিতে পারেন। এই মেয়েবৈঠকে গ্রামস্থ বড়, ছোট, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, প্রৌঢ় এবং তদাভাবে এমন কি গাছের কাঠবিড়ালী, চালের গিরগিটি, টিকটিকি, বাড়ীর পোষমানা কুকুর বিড়াল প্রভৃতিরও সমালোচনার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই কঠিন। তায় আবার গ্রামে বিবাহ, আর যায় কোথা। কতদিনের সঞ্চিত রুদ্ধ বাষ্পশক্তি (Pent up energy) এখন (Safety valve)পথে ছাড় পাইয়াছে, আর রক্ষা নাই, অশীতিবর্ষ বয়স্কা বৃদ্ধ হইতে যুবতীসকল তাহাদের নিজের, তাহাদের আত্মীয়স্বজনের, পরে “বসুধৈব, কুটুম্বকম্” এই কথার যাথার্থতা সম্পাদনে “সইএর বউএর বোনপো বউএর বকুল ফুলের ভাগ্নী জামাইএর বিবাহের”, ও তাহার আনুসঙ্গিক তত্ত্ব সকলের আদ্যশ্রাদ্ধ চলিতে লাগিল। কিশোর বয়স্কা এবং অল্প বয়স্কা বালিকারা কাহার কিরূপ বর হইয়াছে, কিরূপ বর

হইলে ভাল হয়, কাহার বর বড় রসিক, কাহার বর ফচ্‌কে, কাহার বাসরে কি হইয়াছিল, এ বাসরে কি কি হওয়া সম্ভব, তাহার এষ্টিমেট। কে কোন্ কাপড়, কোন্ কোন্ এবং কি কি গহনা পরিবে ইত্যাদি বিষয়ের গভীর গবেষণা পূর্ব্বক আলোচনা চলিতেছে। বাহিরে ছোট ছেলে মহলে ধূম পড়িয়া গিয়াছে। আগে বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী, মধ্যে বিবাহ সভায় প্রশ্নোত্তর লইয়া মহা জরজার লড়াই হইত, এখন আর তাহার কিছুই নাই। এখন ছোট ছোকরা মহল বিবাহ সভায় মা স্বরস্বতীর সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া কেবল বেশভূষার পারিপাট্য, মস্তকের কেশের পারিপাট্য, থিয়েটারের টপ্পার উৎকর্ষতা সাধনে ব্যস্ত থাকিয়া "ডিম ফুটেই বেল্লিকের" যাথার্থতা সম্পাদন করিতেছে।

আনন্দের সময় শীঘ্রই কাটিয়া যায়। বিবাহ দিনে কন্যার বাড়ীতে মহা কোলাহল—বাহিরের বাটীতে নানাপ্রকার লোকের গমনাগমন, নানা লোক নানা কার্য্যে ব্যস্ত—অন্দরে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মধ্যে মাঙ্গলিক কার্য্যের সময় শঙ্খধ্বনি ও উচ্চ কলরব ও হাস্য—এধারে বিবাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকলের যোগাড়—ওধারে নিমন্ত্রিতগণের যথাযোগ্য চর্ব্ব্য, চোস্য, লেহ্য, পেয়ের ব্যবস্থার জন্য হুড়াহুড়ি ইত্যাদিতে একেবারে সরগরম—দিনমণি আপনার দৈনন্দিন কার্য্য সম্পাদনে ক্লান্ত হইয়া যেন সন্ধ্যা সুন্দরীকে "একটিনি" দিয়া অস্তাচল, শিখরে গা ঢালিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘণীভূত হইলে, কেরোসীন ও এসিটীলিন গ্যাসের আলোকে বাড়ী হাঁসিয়া উঠিল। কন্যা কর্ত্তার বাড়ীতে ত [illegible]

[illegible]গ্রেল এ[illegible]

[illegible]হরি বাবুর বৈবাহিক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ম[illegible]র গ্রামের একজন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ—তাঁহার পুত্রের বিবাহে আয়োজন বড় কম করেন নাই। তাঁহার একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিতেছেন বলিয়া

তিনি অনেক খরচ পত্র করিয়া ও অনেক আত্মীয়সহ অদ্য বৈদ্যবাটী গ্রামে বিবাহ দিতে চলিয়াছেন। বর বৈদ্যবাটী ষ্টেশনে পঁহুছিল এবং তথা হইতে অনেক লোকজন বাদ্য ও আলো সহ সহরাভিমুখে চলিল, রাস্তায় অনেক লোক দাঁড়াইয়া এই শোভাযাত্রা দেখিতে লাগিল, ও অনেক বাটীর ছাত ও জানালা হইতে অনেক মেয়ে ছেলে হাতের সমস্ত কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া দেখিতে লাগিল, পল্লীগ্রামের পক্ষে ইহা একটী ধূমধামের বর বলিয়া তাহাদের বোধ হইতে লাগিল এবং যথার্থই ইহাতে ভোলানাথ বাবু যথেষ্ট ব্যয় করিয়াছেন। অবশেষে প্রায় রাত্র নয় ঘটিকার সময় বর ভজহরি বাবুর বাটী পঁহুছিলেন, বর-যাত্রীর ভিতর অনেক রকমের লোক ছিল, আত্মীয়স্বজন গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ ছিলেনই এবং ভোলানাথ বাবুর অনেক চাষা প্রজাও ছিল। বরযাত্রীরা সকলে যখন বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল, সেই সময় সদর দরজায় ভজহরি বাবু ও তাঁহার দুই পুত্র তথায় দাঁড়াইয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। বাড়ীতে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল, ভজহরি বাবু বরকর্ত্তা ও বরযাত্রীদের লইয়া বড়ই ব্যস্ত আছেন ও মধ্যে মধ্যে ডাকিতেছেন, ওরে রামা, শ্যামা জল, পান ও তামাক লইয়া আয়। এইরূপে কিছুকাল কাটিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই শুভলগ্নে ভজহরি বাবু তাঁহার কন্যাকে সুপাত্রে দান করিলেন, বরযাত্রীও পরিশেষে বরকর্ত্তাদের যত্নের সহিত খাওয়াইয়া দিলেন, তাহারা সব আপন আপন বাড়ী অভিমুখে চলিয়া গেল। ওদিকে কন্যাও বাসরঘরে গেল এবং বাটীর মেয়েরা সব বরকে লইয়া বাসরঘর আমোদিত করিতে লাগিল।

বাসরঘরের বর্ণনা আর কি করিব—বড় বড় সাহিত্যরথী ও কবিবৃন্দ ইহার স্বরূপ বর্ণনা উজ্জ্বলরূপে করিয়া গিয়াছেন। সেখানে

আমার ন্যায় ব্যক্তির এ বিষয়ে চেষ্টা করা খঞ্জের পর্ব্বত লঙ্ঘনের ন্যায় সুদূরপরাহত। "বাসর" এই কথা মনে হইলেই এক অভূতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব আনন্দে মন নাচিয়া উঠে। কত কথা, অতীতের সুখস্মৃতি মন-পটে উদয় হয়—তখন বর্ণনা করিতে যাইতেছি তাহা ভুলিয়া যাইতে হয়—মন সুখ-স্মৃতি লইয়া আত্মহারা হয়—বাহ্যিক জগতের স্থিতি লোপ পায়—মোট কথা বলিতে কি—আমাকে পাঠক পাঠিকা হয়ত বিদ্রুপ করিবেন; কিন্তু কি করিব—আমি নাচার—আমার মনে যা হইতেছে, তাহাই স্বরূপ বলিতেছি—আমাদের এত বয়স হইয়াছে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি—এ বুড়া বয়েসে বাসরের নাম হইলে মুখে লাল পড়ে ও ফের হামাগুড়ি দিতে ইচ্ছা করে। পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রাপ্ত—নৈতিক বলের পক্ষপাতী ব্যক্তিবর্গ রাগে ও ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া এখনি আমার ন্যায় Old Foolএর একশতবার মৃত্যুর ব্যবস্থা বা চৌদ্দ বৎসর ফাঁসীর ব্যবস্থা করিবেন, না হয়ত অশ্লীলতার খনি বলিয়া ধরাইয়া দিয়া Moralityর পরাকাষ্ঠা দেখাইবেন। কিন্তু তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমার কল্পিত বাসর এবং আধুনিক বাসরের সময়গত অনেক প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বেকার সে তালপুকুরের এখন পুকুর নাই, কেবল শুষ্ক তালগাছ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পূর্ব্বের সে বাসরের নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের একটা আন্তরিকতা ছিল—এখন তাহা লোপ পাইয়াছে। তখন কিশোরী ও যুবতীগণ—যাহারা সম্পর্কে বরের সহিত কথা কহিতে পারেন, তাঁহারাই কেবল শিষ্টভাবে বসন পরিহিত হইয়া অবগুণ্ঠণের মধ্য হইতে, আপনাদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিতা কোন অপেক্ষাকৃত মুখরা বয়স্যাকে মধ্যস্থা (spokes man) করিয়া অলক্ষ্যে, স্বগতের ছলে, খুব নিম্নস্বরে, দুই একটা নির্দ্দোষ ঠাট্টা তামাসা বরের

দিকে ছুড়িয়া মারিতেন—আর সেকালের বরেরাও যেন বিবাহ বাড়ীতে বাসরঘরে "বর না চোর" সাজিয়া অলঙ্কারের রুনুঝুনু-নিক্কণি-সমন্বিত ও মলের শব্দে বিভাসিত অবগুণ্ঠনবতী রমণী-বূহের মধ্যে পড়িয়া একেবারে বিশেষতঃ পাশের চেলীর পুঁটুলির মোহে তন্ময় হইয়া জুজুর মত চুপ করিয়া থাকিত এবং যে উহাদের মধ্যে বড়ই সাহসী, সে নয় দুই একটা কথার উত্তর কাটিত মাত্র; কিন্তু এখনকার বাসর বর্ণনার অযোগ্য—এখন মুক্তবেণীশোভিতা বা আধঘোমটাবৃতা আধুনিকবৈদেশিক-অৰ্দ্ধনগ্ন-বেশভূষায় ও অলঙ্কারাদিতে সজ্জিতা, লক্ষ্ণৌ, বেণারস-হইতে-আনীত স্ফূর্ত্তি-জরদা-মিশ্রিত-তাম্বুলরাগরঞ্জিত-অধরা, চটুলচাহনিযুক্তা নারীসুলভলজ্জাবিরহিতা ও আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্তা কিশোরী, যুবতী ও প্রৌঢ়াগণের একত্র সম্মিলন—বর বাবু বা বিংশশতাব্দীর জামাই বাবুও আধুনিক—অতএব সেয়ানে সেয়ানে মেশামিশি—অনেক সময়—রসিকতার প্রসঙ্গে শ্লীলতার মাথায় বিনামা ব্যবহার করা হয় এবং রুচির আদ্যশ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত গড়ায়।

সমাজহীনতা জাতীয় হীনতার পরিচায়ক; সময়ের পরিবর্ত্তনে প্রাচ্য প্রতীচ্যের সম্মিলনে কত বৈদেশিক ভাব আমাদের সমাজের ভিতর ক্রমশঃ প্রবেশ করিয়া কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে ও ঘটাইতেছে এবং আমাদের নৈতিক বল শিথিল করিয়া দিতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এইরূপে দেখিতে দেখিতে রজনী প্রভাত হইয়া আসিল, অদ্য বর ক'নেকে লইয়া বাটী যাইবে; সেই জন্য, ভজহরি বাবু ও তাঁহার স্ত্রী প্রমদার মনটা বড়ই খারাপ হইয়াছিল; যাহা হউক, তাহারা বিমর্ষমনে শুভকার্য্যাদি সব শেষ করিয়া লইলেন, এদিকেও দেখিতে দেখিতে বর

কর্ত্তারা আসিয়া উপস্থিত হইল। ভজহরি বাবু তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সমাদর ও অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং জলপান ও তামাক দিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তিনি বাটীর ভিতর খবর দিলেন এবং তাঁহাদের জলযোগের বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। প্রমদা তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আহারের বহুবিধ ভাল ভাল দ্রব্য তৈয়ার করিয়া বর-কর্ত্তাদের জন্য পাতা সাজাইতে লাগিলেন। ওদিকে বাড়ীর মেয়েরা শীঘ্র শীঘ্র বর ক'নের মাঙ্গলিক কার্য্য সকল সমাধা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বাড়ীর সকলেই একটা না একটা কার্য্যে ব্যস্ত আছেন; কিন্তু আমাদের যতীন আজ কেন হঠাৎ কিছু বিমর্ষ আছেন। তাহা পাঠক পাঠিকা বলিতে পারেন কি? যাহা হউক, সে বিষয়ে আমরা আর এখানে সময় নষ্ট করিতে পারিব না, আমাদের এখনও জানিবার অনেক বাকি।

হিন্দুর ঘরে ক'নে বিদায় বড়ই করুণ রস মিশ্রিত—হিন্দু স্ত্রীর একমাত্র গতি অবলম্বন যে স্বামী, তাহার সহিত তাহার বাটীতে যাইতেছে—আবার ফিরিয়া আসিবে এবং যাওয়া আসা চলিবে, তবু মার, বাপের ও বাটীস্থ অপর সকলের চোখ ফাটিয়া জল পড়ে কেন? "মায়ার বন্ধন ছেদ মাত্র" এতদিন মা বাপের একেবারে নিজস্ব ছিল, এখন তাহা রহিল না।

ভোলানাথ বাবু, তাহার পুত্র ও পুত্রবধূ এবং পাত্র মিত্র লইয়া নিরাপদে চন্দননগরে পৌঁছিলেন; ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী তাঁর পুত্রবধূর মুখদর্শন করিয়া যারপর নাই সুখী হইলেন এবং ঘরের লক্ষ্মীকে কোলে করিয়া আনিয়া—বরণাদি করাইলেন; নূতন বৌমার ও তাহার বাপেদের অনেক সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। বাড়ীর অপর মেয়েরা সব ক'নে দেখিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়াছিল এবং

মনে মনে ভাবিয়াছিল ; বৌ বুঝি ভাল হইবে না, পরে যখন তাহারা নিজে চক্ষে দেখিল, বলিল—বাঃ বেশ মেয়েটি ত ? বেশ রং, মুখশ্রী ভাল এবং আমাদের ছেলের সঙ্গে মিলিয়াছে বেশ, আমাদের ছেলের রং কিছুর নিন্দার নয়, এইরূপ অনেকেই নিজের নিজের মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

গোলমালে আমোদে প্রমোদে সেই দিন কাটিল।

পরের দিন ফুলশয্যা—কেহ কেহ সেই দিনেই পাকস্পর্শের দিন স্থির করেন। ভোলানাথ বাবুর ছেলের বিবাহ বৃহস্পতিবার হইয়াছিল, সুতরাং তাহার পরবর্ত্তী শনিবার ফুলশয্যার দিন।

কলিকাতা উপকুলস্থিত গ্রামবাসীদের মধ্যে যাঁহারা রোজ কলিকাতা আফিসে কর্ম্ম করিতে যান; তাহাদের পক্ষে ও তাঁহাদের বাড়ীর স্ত্রীলোক-দিগের পক্ষে শনিবার বড়ই মধুবার। কেন না, পরের দিন তাহাদের প্রত্যূষে উঠিয়া তাড়াতাড়ি স্নানাদি সমাপন করিয়া অর্দ্ধসিদ্ধ তপ্ত ভাত কয়েক নিশ্বাসে খাইয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া আফিসে যাইতে হইবে না, আর বাড়ীর মেয়েরা সেই দিন সেই জন্য একটু হাঁপ ছাড়িবার অবসর পান। অতএব এ ক্ষেত্রে এই সুবিধার জন্য শনিবারেই ফুলশয্যা ও পাকস্পর্শের দিন স্থির করিবার জন্য অনুরোধ উপরোধ ও advice gratis আসিতে লাগিল। কিন্তু কেহ কেহ শনিবারে পাকস্পর্শ রীতি আচার বিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করায়, ভোলানাথ বাবু সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে পাকস্পর্শের জন্য আহারাদির নিমন্ত্রণ ফুলশয্যার দিনেই রাখিলেন। রবিবারে নিয়মমত কেবল বৌভাত ও আপনার নিকটস্থ আত্মীয়স্বজনের মধ্যাহ্ণ ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি নূতন বধু ঘরে আনিয়াছেন, অতএব আত্মীয়স্বজন পরিচিত ও গ্রামস্থ সর্ব্বসম্প্রদায়স্থ লোককে নিমন্ত্রণ করিলেন।

শনিবার হইতেই গ্রামে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতেই ভোলানাথ বাবুর নিমন্ত্রিত দুই পাঁচটী করিয়া লোক আসিতে লাগিল, তাঁহাদের সকলের মুখে এক কথা, ক'নের বাড়ী হইতে ফুলশয্যা আসিয়া পৌঁছিয়াছে কি না। যখন বরের বাটীতে এই রকম চলিতেছিল, তখন আসুন পাঠক পাঠিকারা ক'নের বাড়ীতে ফুলশয্যা পাঠানর কিরূপ বন্দোবস্ত হইতেছে দেখা যাউক।

ভজহরি বাবু অঙ্গীকৃত ফুলশয্যার সমস্তই আয়োজন করিয়াছিলেন, সন্ধ্যার গাড়ীতে দশজন লোক মারফৎ এবং নাপিতের কর্ত্তৃত্বাধীনে বরের বাড়ীতে ফুলশয্যা রওনা হইল। পাকস্পর্শের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য ভজহরি বাবু যতীনকে যাইতে আদেশ করিলেন। যতীন কাপড় চোপড় ছাড়িয়া ফুলশয্যার সঙ্গেই রওনা হইলেন।

ভোলানাথ বাবুর বাটীতে পৌঁছাইতে রাত্র আটটা বাজিয়া গেল।

ফুলশয্যা আসিয়াছে, ফুলশয্যা আসিয়াছে মহা রব উঠিল, শাঁক বাজিয়া উঠিল এবং নিমন্ত্রিত রমণীগণের কলরবে বাটী মুখরিত হইতে লাগিল। নিমন্ত্রিত লোকদের আদর ও আপ্যায়ন ও আহারাদি সমাপনান্তে বাড়ীর ভিড় কমিতে লাগিল।

ভোলানাথ বাবু যতীনের নিকট নূতন বৈবাহিক ও তাঁহার বাটীস্থ সকলের কুশল সংবাদ লইলেন। যতীনও যথাযথ উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু তাহার মনটা হঠাৎ কোন অভাবনীয় কারণে, কোন এক অতীত স্মৃতি জাগরিত করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ চিন্তিত করিল। যতীনের আদর আপ্যায়ন বড় কম হইল না। আহার সমাপনান্তে যতীন আপনার ছোট বোনটীর সহিত একবার দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তাহাকে ভোলানাথ বাবু সঙ্গে করিয়া ফুলশয্যার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরের দ্বারের নিকট আনিয়া সমবেত মেয়েদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, ওগো

তোমরা একবার নূতন বৌমাকে এখানে আন ত। তাঁহার ভাই তাঁহার সহিত একবার দেখা করিতে আসিয়াছেন।

ভোলানাথ বাবুর আদেশে নূতন বৌমার সমবয়স্কা তিন চারিটী বালিকা ছোট পুঁটীকে সঙ্গে করিয়া যেখানে যতীন দাঁড়াইয়াছিল সেই খানে আনিল এবং উহাদের মধ্যে একজন একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া যতীনকে দেখিয়া বলিল আপনি কি নূতন বৌএর ভাই ?

যতীন হাঁ বলিয়া উত্তর দিবার সময় প্রশ্নকারিণীর মুখের দিকে চাহিতেই যেন তাহাকে কোথাও দেখিয়াছেন, যেন চেনা চেনা বলিয়া মনে হইল। প্রশ্নকারিণীও যতীনকে দেখিয়াই যেন চমকিতা হইলেন, পরক্ষণেই পার্শ্ববর্ত্তিনী আর এক কিশোরীর দিকে ফিরিয়া একটী চিম্‌টি কাটিল। তাহাতে সেই কিশোরী রাগান্বিত হইবার অগ্রে তাহার কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি এক মন্ত্রৌষধি দিল, যাহাতে সেই কিশোরীর রাগ অপনয়ন হইয়া মুখে একটু সলজ্জভাব আসিল এবং সকলের সাক্ষাতেই "চুরি করিয়া যতীনের মুখ দেখিতে" লাগিল। আমাদের এই সকল কথা বলিতে অনেক সময় লাগিল বটে; কিন্তু এই সকল ঘটনা নিমেষের মধ্যেই চুকিয়া গেল, প্রশ্নকারিণী ও তাহার চিম্‌টি বিনা বাক্যব্যয়ে হজমকারিণী সহচরীটি কে তাহা আর বলিয়া জানাইতে হইবে কি ? প্রশ্নকারিণীই আমাদের পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত কুমুদিনী ও তাহার কিশোরী সহচরী ভোলানাথ বাবুর কন্যা সুহাস বা সুহাসিনী। এধারে যতীন ব্যাচারী বড়ই বিভ্রাটে পড়িল—কোথায় তাহার ছোট বোনটির সহিত দেখা করিয়া সাময়িক ২।১টা কথা কহিয়া পালা শেষ করিয়া, সেই রমণী ব্যূহের মধ্য হইতে চম্পট দিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে, না তাহার মস্তিষ্কের ও মনের উপর কোন অতীত স্মৃতি জাগাইবার জন্য জোর জুলুম চলিতে লাগিল—ছোট বোনটির

সহিত কথা কহিবে কি ; তাহার মনে কি মন আছে ; অন্যমনস্ক হইয়া কোন রকমে বোনটির সহিত কথা কহিল বটে কিন্তু আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, সে লজ্জার বাধা না মানিয়া দুই একবার নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ছোট পুঁটির পার্শ্ববর্ত্তিনী কিশোরীগণকে দেখিতে ছাড়েন নাই।

এইরূপে গোলমালে কয়েক দিবস কাটিয়া গেল, এক দিবস রাত্রে ভোলানাথ বাবু আহার করিয়া উপরে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার স্ত্রী আসিয়া বলিলেন যে, কাল দুপুর বেলায় একজন ঘটকী এক জায়গা থেকে তোমার মেয়ের সম্বন্ধ লইয়া আসিয়াছিল, বলিতেছিল যে ঘরটি ভাল ও জামাইটি ভাল, তবে তাহারা গৃহস্থ মানুষ তাহাদের মোটা মোটা থামওয়ালা বাড়ীও নাই আর জুড়ি গাড়ী নাই। ভোলানাথ বাবু বলিলেন যে হাঁ, এইবার আমার সুহাসিনীর একটি ভাল বর পাইলেই হয়। আমার সব কাজ শেষ হয়—তা বেশত দেখ—তোমার যদি ওখানে পছন্দ হয়, আর না হয়, আরও দুই এক জায়গায় দেখ ; কিন্তু একটা কথা তোমায় বলি, এমন ঘর দেখিবে যেখানে জামাই খুব ভাল হয়, তাদের পয়সা তত থাকুক আর নাই থাকুক।

ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী বলিলেন—যে, হাঁ আমিও তাই তাহাকে বলিয়াছি। এইরূপে নানারূপ কথোপকথনের পর তাঁহারা উভয়ে শয়ন করিতে গেলেন।

পরদিন প্রাতে পুনরায় সেই ঘটকি আসিল এবং বলিল, কি মা কি হইল, তোমাদের কি ঐ জায়গায় বিয়ে দেওয়া মত ?

ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী বলিলেন যে হাঁ—বাবুকে বলিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন যে, আমার তত বড় ঘর না হইলেও চলিবে, কিন্তু জামাইটি যেন খুব ভাল হয়।

ঘটকী। মা তোমার যে জামাইয়ের কথা আমি বলিতেছি, সে ছেলের গুণ আর তোমায় কি বলিব—স্বভাব চরিত্র নিখুঁত, লেখা পড়ায় মাছারি, যেন কার্ত্তিকের মত চেহারা, বয়সও কম—আন্দাজ ১৯।২০ বৎসর তবে মা আমিত গোড়ায় বলিয়াছি যে, তাহারা গৃহস্থ মানুষ।

ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী। আচ্ছা, তুমি ঐইখানে বোস; আমি কর্ত্তাকে একবার ডাকি—এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে ভোলানাথ বাবুকে সঙ্গে লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন।

ভোলানাথ বাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই তোমার সেই ঘটক ঠাকরুণ যাহার কথা বলিয়াছিলে?

ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী। হাঁ, এই সেই লোক, এ বলিতেছে যে ছেলেটী খুব ভাল ও কার্ত্তিকের মত চেহারা, তবে তাহারা গৃহস্থ মানুষ।

ভোলানাথ বাবু। তাইত চাই। আচ্ছা, আমি গোটা কতক কথা জিজ্ঞাসা করি, বলি হাঁগা ভাল মানুষের মেয়ে, তুমি যে সম্বন্ধ আনিয়াছ তাঁহাদের বাড়ী কোথায়? আর ছেলের বাপের নামই বা কি? আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

ঘটকী। বাবু, ছেলের বাপের নাম ভজহরি ঘোষাল বাড়ী বৈদ্য-বাটী গ্রামে।

ভোলানাথ বাবু। ও ভজহরি বাবুর ছেলে, ভজহরি বাবু যে আমাদের নূতন কুটুম্ব, বৈবাহিক, এত আমাদের জানা ঘর। আচ্ছা, তা বেশ হয়েছে—ও ঘরত ভাল আর, ভজহরি বাবুর ছেলেদেরও আমি জানি, তারাও খুব ভাল ছেলে, আচ্ছা—তুমি যাও আমার মত আছে। ওই খানেই আমি আমার মেয়ের বিবাহ দিব, তুমি তাদের বলিও আর তাঁরা কি কি পাওনা চাহেন, তাহা আমায় পরে জানাইও।

ঘটকী। আচ্ছা বাবা, আমি তবে আসি, কিন্তু দেখিও কথার যেন নড় চড় না হয়, মা তোমায়ও বলিতেছি যেন গরীব মেয়ের দিকে নজর থাকে। আমি বাছা তোমার দিক বই তাঁদের দিকে টানবো না, তবে আমি আসি, এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ভোলানাথ বাবু তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, কেমন ঠিক বলিয়াছি ত? আর তোমার ওখানে দেওয়া পছন্দ ত?

ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী। হ্যাঁ, ও ত আমাদের জানা ঘর, তবে ছেলেটী কেমন তা জানা নাই বটে, তবে আমাদের বউমার নিকট হইতে সমস্ত খবর পাওয়া যাইবে।

ভোলানাথ বাবু। হাঁ, হাঁ, বৌমার কাছেই তাঁহার ভাইএর সকল কথা মিলিবে। তবে সে ছেলে মানুষ, আচ্ছা, তাকে একবার ডাকনা দেখাই যাক।

ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী তাঁহার বউমাকে ডাকিলেন, বৌমা—এ ঘরে একবার এস ত। লজ্জা কি—তোমার শ্বশুর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। বৌমা ভারি বিপদে পড়িল—ঘোমটা টানিয়া দিয়া অতি ধীরে ঘরের ভিতরে উপস্থিত হইলেন।

ভোলানাথ বাবু। হাঁ মা, এইবার যে তোমায় তোমার ঠাকুরজির বিবাহের একটু ঘট্‌কিগিরী করিতে হইবে। কিন্তু মা, তোমায় ঘট্‌কি বিদায় কিছু দিব না।

বৌমা লজ্জায় মুখ হেঁট করিয়া আর একটু ঘোমটা দিয়া বসিলেন।

শাশুড়ী। ওকি, অত আর লজ্জা করিতে হইবে না—বউমা, নাও মুখ তুলে বস।

ভোলানাথ বাবু। হাঁ মা, তোমার কি একটি ভাইএর বিবাহ হয় নাই?

ঘোমটার মধ্য হইতে আস্তে আস্তে কথা বাহির হইল—না।

ভোলানাথ বাবু। সেইটি কি তোমার ছোট দাদা, তার নামকি মা?

বউমা। হাঁ, সেইটি আমার ছোটদাদা—নাম যতীন।

ভোলানাথ। তোমার ভায়ের বয়স কত, আর কেমন ছেলে?

বউ মা। আন্দাজ ১৯।২০ হইবে, বলিয়া মুখ হেঁট করিয়া রহিলেন।

ভোলা। মার আমার লজ্জা হয়েছে, আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, তোমার ভাই কি করে মা?

বউ মা। না, সে কিছু করে না, বাড়ীতেই থাকে।

ভোলা। আচ্ছা, যাও মা, তোমার অনেক কষ্ট হচ্চে।

ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী। দেখলে বউ-মার নিকট হইতে তবু অনেকটা খবর জানা গেল। এখন তাঁরা কি কি চান, তাহার একটা ঠিক হইয়া গেলেই হয়, বোধ হয় তাঁরা অল্পেতে রাজী হবেন না, কি বল?

ভোলা। দেখ এখন তাঁরা কি বলেন। আমার বোধ হয়, তাঁরা কুটুম্ব ঘর বলিয়া বেশী কিছু চাইতে পারিবেন না; আর যদি চান, তাহলে তাই দিতে হবে, কারণ, আমরাও তাঁদের মেয়ের বিয়ের সময় লইয়াছি। সে যাক, এখন পরের কথা পরে হবে, এখন বেলা অধিক হইয়াছে, আমাদের খাবারের উদ্যোগ দেখগে, এই বলিয়া উভয়ে উভয় দিকে চলিয়া গেলেন।

পাঠক পাঠিকা! চলুন, আমাদের সুহাসিনীর খপরটা একবার লওয়া যাক।

পিতা মাতা ও বউ যখন কথা কহিতেছিল, তখন সুহাস দরজার আড়াল হইতে সব শুনিতেছিল এবং বুঝিল যে তাহারই বিষয় তাঁহারা কথা কহিতেছেন।

বলা বাহুল্য, সুহাসের জলে ডোবার পর হইতেই তাহার ক্ষুদ্র কোমল মন কি জানি কি এক অজানিত ভাবে যতীনের দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। আবার ছোট পুঁটির সহিত তাহার ভাইএর বিবাহ হইয়াছে।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।





ভজহরি বাবু তাঁহার কন্যার বিবাহের পর হইতেই শরীরটা কিছু বেশী রকম খারাপ বোধ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী প্রমদাসুন্দরীর মনটা বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি একদিবস আহারান্তে যখন ভজহরি বাবু শয়ন গৃহে বসিয়া আছেন, সেই সময় আস্তে আস্তে বিমর্ষ বদনে যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ইহা দেখিয়া ভজহরি বাবুর মনে একটা সন্দেহ হইল, তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, এ ত কখনও এরূপ চুপ করিয়া থাকে না, সদাই আহ্লাদিত ও হাসি মুখে কালযাপন করে, হঠাৎ আজ কেন এর এ ভাব হইল, ইহার ভিতর নিশ্চয় কিছু আছে; ইহা জানিতে হইবে, এই বলিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসিলেন—প্রমদা, তোমার শরীরটা কি খারাপ আছে? তুমি অমনধারা বিমর্ষভাবে বসিয়া কেন?

প্রমদার এতক্ষণে চমক ভাঙ্গিল, তিনি তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় টানিয়া দিয়া বড়ই লজ্জায় পড়িলেন এবং এর যে কি জবাব দিবেন, তাহা আর ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না।

ভজহরি বাবু তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া তাঁহার মনে কেমন একটা ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল, তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, প্রমদা, তুমি কি ভাবিতেছিলে বল?

প্রমদা। কি আর মাথামুণ্ডু ভাববো, তবে তোমার কথাটা ভাল বুঝিতে পারি নাই, তাই উত্তর দিতে দেরি হইতেছে—এ ছাড়া আর অন্য কিছুই নহে।

ভজহরি বাবু। আমি বলছিলাম যে, তুমি অমনধারা বিমর্ষভাবে আসিয়া বসিলে কেন? তোমার শরীর ভাল আছে ত, এখন বুঝিতে পারিলে ত?

প্রমদা। তোমার কাছে কি একবার চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার যো নাই, যখন আসিব তখনি কি কথা কইতে হইবে। আচ্ছা, এবার থেকে জানা রহিল—আর কখনও তোমার সাম্‌নে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব না।

ভজহরি বাবু। প্রমদা আর ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিলে কি হবে, বল নিশ্চয় তোমার শরীরটা খারাপ আছে—তা না হলে তোমায় আর চুপ করিয়া থাকিতে হয় না।

প্রমদা। নাও, তুমিত কেবল আমায় ঠাট্টা করিতে দেখ কিনা, আমার শরীরে আবার কি ছাই হয়েছে, যে খালি খালি বল্‌ছ শরীর খারাপ হয়েছে। আমার শরীর ত ভাল আছে।

ভজহরি বাবু। আচ্ছা, শরীর যদি ভাল আছে, তবে অমনধারা হয়ে বসে বসে কি ভাবছিলে বল?

প্রমদা। ভাবব আবার কি, কই কিছুই ত ভাবি নাই, এই বলিয়া তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না, চোখ ছল ছল করিয়া জল ভরিয়া উঠিল এবং নীরবে মাথাহেঁট করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

ভজহরি বাবু। কি প্রমদা আবার যে বলিতে বলিতে চুপ করিয়া রহিলে? এই বলিয়া ভজহরি বাবু মুখ ফিরাইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখেন যে, তাঁহার স্ত্রী প্রমদা নিরবে রোদন করিতেছেন, ইহা দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া নিকটে গিয়া অতি ব্যাকুল হইয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, ছি প্রমদা তুমি আবার কাঁদিতে বসিলে? কাঁদিবার মতন কথাত তোমাতে আমাতে কিছুই হয় নাই।

প্রমদা। না, আমি সে জন্য কাঁদিতেছি না।

ভজ। তবে কি জন্য তুমি কাঁদিতেছ আমায় তাহার সঠিক বিবরণ বল, তাহাতে আমার দ্বারা যদি তোমার মনোদুঃখের কোন রকমে অবসান হয়, তাহা হইলে আমি তাহা করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি।

প্রমদা। না, সে তেমন কিছুই নয় যে তোমায় তাতে প্রাণ দিতে হইবে, ও আর তুমি শুনিয়া কি করিবে, মিছে তোমার মনটা খারাপ করা কেন!

ভজ। প্রমদা, এমন কি কথা তোমার আছে, যাহাতে আমার মন খারাপ হইবে—আর তোমার মনটা যখন খারাপই আছে, তখনও আমার মন খারাপ হবেই। যাহা হউক, তুমি শীঘ্র বল কি কথা, আমার শুনিবার জন্য মন বড়ই ব্যস্ত হইয়াছে।

প্রমদা। তুমি তা'হলে দেখছি না শুনে ছাড়ছ না, তবে শুন, বলিয়া স্বামীর পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, আমার অপরাধ লইও না, কিছু আমায় মার্জ্জনা কর।

ভজ। কি তুমি পাগল নাকি তুমি আবার কবে কি অপরাধ করিয়াছ যে, আমার কাছে মাপ চাহিতেছ—নাও বল।

প্রমদা। দেখ, আমি বলিতেছিলাম যে তোমার শরীরটাত বড়ই খারাপ হচ্ছে, আগেত খারাপ ছিলই, তবে পুঁটির বিবাহের পর থেকেইত কিছু বেশী রকম খারাপ হইয়াছে, তাই বলিতেছিলাম যে, তুমি থাকিতে থাকিতে আমার শেষ কাজটা (যতীনের বিবাহ) করিয়ে দাও, তাহা হইলে তুমিও নিশ্চিন্ত—আমিও নিশ্চিন্ত। আরও যতীনের মুখটা আজকাল ভাল করিয়া দেখিয়াছ কি? কি রকমের একটা ভাবনাযুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

ভজ। হাঁ, ঠিক বলিয়াছ, আমিও ওটা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি এবং তোমায় রোজ বলিব বলিব মনে করি, কিন্তু মনে থাকে না, আজ যেমন কথা উঠিল, তাই মনে পড়িল, তা বেশ, তুমি আজ থেকে ওর ১টি ভাল সম্বন্ধ দেখ, আরও যখন তোমার মনে উঠিয়াছে যে বিবাহ দেওয়া চাই, তখন আর দেরি করা উচিৎ নয়, শীঘ্র শীঘ্র কাজটা হইয়া যাক।

প্রমদা। আচ্ছা, তোমার যখন হুকুম পাইয়াছি, তখন কল্য হইতেই আমি ইহার চেষ্টায় থাকিব, এখন চল, অনেক রাত হইয়া গেল শোয়া যাক; কাল আবার পুঁটি আসিবে, এই বলিয়া উভয়ে শয়ন করিতে গেল।

পরদিন প্রাতে ভজহরি বাবুর কন্যা তাহার শ্বশুরালয় হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভজহরি বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর আহ্লাদের সীমা রহিল না, কারণ, তাঁহাদের মেয়ে এইমাত্র এই প্রথম শ্বশুর ঘর করিয়া আসিয়াছে।

মাথায় অল্প ঘোমটা দেওয়া পুঁটি পাল্কি হইতে নামিয়াই বাপ মা ও

দাদাদের প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। তাহার বাপ মা হাত ধরিয়া উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন আছ মা, তোমার শ্বশুর শাশুড়ী ও বাড়ীর আর আর সকলে কেমন আছেন ?

পুঁটি। বাড়ীর সকলে ভাল আছেন।

এইরূপে নানা কথোপকথনের পর প্রমদা তাঁহার কন্যা আসিয়াছে বলিয়া বিবিধ ব্যঞ্জন সহ অন্ন তৈয়ার করিলেন এবং তাঁহার স্বামী, পুত্রদ্বয় ও কন্যাকে ভাত খাইতে ডাকিলেন। অবশেষে সকলে ভাত খাইতে বসিলে পর প্রমদা তাঁহার কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, পুঁটি এইবার তোমার ছোট দাদার একটা ভাল বৌ খুঁজিয়া দে দিখিনি।

ইহা শুনিয়া ভজহরি বাবু বলিয়া উঠিলেন, হাঁ, বেশ ঘটকী তুমি ঠিক করেছ, ওবেটীর দ্বারাই ভাল ভাল মেয়ের সন্ধান পাওয়া যাইবে, ওদের শ্বশুর বাটীর কাছে অনেক ভাল ঘর আছে না পুঁটি ?

পুঁটি। হাঁ, আমি আবার বুঝি লোকের বাড়ী বাড়ী খুঁজে খুজে বেড়াব যে, কোথায় ভাল মেয়ে আছে, তবে তোমাদের একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম তাহা এখন এই কথা উঠিতে আমার মনে পড়িয়া গেল, দেখ বাবা ও মা একদিন আমার শ্বশুর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—হাঁ বউমা, শুনলুম তোমার একটি ভায়ের বিবাহ নাই, তাই কি ঠিক ?

আমি বলিলাম, হাঁ, আমার ছোট দাদার বিবাহ হয় নাই, তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সেটি কি তোমার ছোট ভাই এবং তার নাম কি, আর সে কি করে ?

আমি বলিলাম, তাহার নাম যতীন, সে আমার ছোট দাদা, আর সে এখন কিছু করে না।

আপনারা ত জানেন আমার এক আইবুড় ননদ আছে।

ইহা শুনিয়া ভজহরি বাবু ও তাঁহার স্ত্রী উভয়ে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং বলিলেন, তা মা, ভগবান করুন, আমার যতীনের যেন ভোলানাথ বাবুর মেয়ের সহিত বিবাহ হয়, ওখানে যদি হয়, তাহলে আর আমাদের কোথাও মেয়ে খুঁজিতে হইবে না, ও মেয়েটিত আমাদের দেখা আছে, আর মা তুমিও ত জান, রোজ দুই বেলা তাকে দেখছ, তুমি বলনা।

কন্যা। হাঁ মা, মা ও মেয়েটাকে বেশ ভাল দেখিতে, ও রং খুব আছে, তবে একটু বেশী বয়স হয়েছে—এই যা, তা না হলে আর সব ভাল।

এধারে যতীনও ত ভাত খাইতে বসিয়াছে, সে মা বাপের মুখ হইতে তাহার বিবাহের কথা উঠিল শুনিয়া, কোথা হইতে লজ্জা আসিয়া তাহাকে যেন নাগ-পাশে ঘিরিয়া ফেলিল। সে আগে তবুও দুই একটি কথা কহিতেছিল, এখন লজ্জায় অধোবদন হইয়া নীরবে অন্যমনে ভাত খাইতে লাগিল, তাহার উপর যখন পুঁটির মুখ হইতে ভোলানাথ বাবুর মেয়ের সহিত (পাঠক পাঠিকার মনে আছে সেই আমাদের "সুহাসের" সহিত) তাহার বিবাহ সম্বন্ধ হইতেছে শুনিল, তখন তাহাতে তাহার মন আর রহিল না—মন উড়িয়া কল্পনা-সাহায্যে মানসচক্ষে তাহার সুহাসের সহিত এক আপার্থিব সুখ-স্মৃতি দীপ্ত-রাজ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

চতুরা পাঠিকাগণ! ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া হয়ত বলিবেন যে, গ্রন্থকার কি প্রকারে যতীনের মনের অবস্থা জানিলেন, তিনি গণককার নাকি? তদুত্তরে আমার বিনীত নিবেদন এই যে—কারণ হইতেই কার্য্য হয় এবং কার্য্য হইতেই কারণ অনুমিত হয়। এই সময়ে যতীনের কায়াতে যে তাহার মন অনুপস্থিত ছিল, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, যতীন

পল্‌তার সুক্তনি খাইতে গিয়া মাছের ঝোলে হাত দিতেছিল—মাছের ঝোলের মাছ ও আনাজ তরকারি হাত দিয়া পাতে তুলিয়া লইতে গিয়া ডালের বাটীর ডালের ভিতর হাত দিয়া—মাছ, আলু, পটল, তুলিতে গিয়া কিছু না পাইয়া অপ্রস্তুত হইল। ভাতের বিষম লাগাতে জলের গ্লাস মুখে তুলিতে গিয়া হাত পিছলাইয়া থালের উপর পড়িয়া গিয়া জল চারিদিকে চড়াইয়া পড়িল।

ইহা দেখিয়া যতীনের মা বলিলেন—যতীন, কি করছ বাছা—আর যদি কিছু না খাস ত উঠিয়া গিয়া আঁচাও এবং কর্ত্তার গাড়ু গামছা দাওয়া হইতে আনিয়া দাও।

বলা বাহুল্য যতীন মাতৃ আদেশ নিমেষে পালন করিতে গিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। অবশেষে সকলের আহার হইয়া গেলে পর, প্রমদা ও তাঁহার বড় বধূ আহারে বসিল, ওদিকে ভজহরি বাবু ও নরেন্দ্র আহার করিয়া বাহিরে বসিলেন। ইতিমধ্যে একজন ধোপ দেওয়া থান কাপড় পরিহিত তিলক কাটা ঘটকী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসিল, এই কি ভজহরি বাবুর বাটী?

ভজহরি বাবু বলিলেন হাঁ এই বাটী; কেন বল দিকিন—এবং তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?

ঘটকী। আমি চন্দননগরের ভোলানাথ বাবুর বাটী হইতে আসিতেছি, তাঁর মেয়ের সম্বন্ধের জন্য।

ভজহরি। তুমি আমার বেয়াইর ওখান থেকে আস্‌ছ, তা বেশ বাড়ীর ভিতর যাও মা, ঠাকুরাণরা আছেন।

প্রমদা খাইয়া হাত ধুইতেছেন, এমন সময় সেই ঘটকী যাইয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল—মা, আমি আপনার বেয়াই বাড়ী থেকে আস্‌ছি। আপনার ছেলের (বউএর) সম্বন্ধ লইয়া, আপনাদের সব ভাল ত?

প্রমদা তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া যাইয়া বসাইল এবং বলিল—হাঁ মা, আমাদের বাড়ীর সব খবর ভাল, তাঁদের বাড়ীর সব ভাল আছেন, আর আমার জামাই কেমন আছে?

ঘটকী। হাঁ আমাদের ও ওবাটীর সব ভাল আর তোমার জামাইও ভাল আছেন, এখন আমি আসিয়াছি যে, আপনারা কি ওখানে ছেলের বিবাহ দিবেন তা বলুন আর আমার বোধ হয় ও মেয়েকে আপনাদের সব দেখা আছে, আরও আপনার মেয়ের কাছে সব জানিতে পারেন, যে কেমন মেয়ে কি বৃত্তান্ত।

প্র। হাঁ, আমাদের ওমেয়েকে জানা আছে বই কি, মেয়েটী ভাল, তবে একটু বয়স হয়েছে যাই হোক তুমি বোস আমি কর্ত্তার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আসিতেছি।

এই বলিয়া প্রমদা তাহার স্বামীর নিকট চলিয়া গেল। ভজহরি বাবু ও ঘটকি ঠাকরুণের আগমনের ফলাফলে জন্য উৎসুক ছিলেন, এমন সময় প্রমদা হেলিতে দুলিতে স্বামীর নিকট গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল, ওগো কর্ত্তা, তোমার ছেলের বিবাহের সম্বন্ধ করিতে বেয়াই বাড়ী থেকে লোক এসেছে, বলে যে ওখানে কি তোমার ছেলের বিবাহ দিবে।

ভজহরি। হা আমি জানি, ও আগে ত আমার কাছে আসিয়াছিল, তা যাক, বেশ ভালই হয়েছে। আমরা যা ভাবছিলাম, তা ভগবান যোটাইয়া দিয়াছেন, তা বেশ আমার আর মত কি? তোমার যদি মত থাকে তাহলেই হল কিন্তু তোমায় একটা কথা বলিয়া দিই, দেনা পাওনার বিষয় যেন একটু বিবেচনা করে বলিও কারণ, ও আমাদের বেয়াই বাড়ী, বুঝলে ত!

প্রমদা। হাঁ, আমারও মত আছে যে আমি যেন আমার যতীনের বিবাহ ওখানে দিতে পারি, তবে দেনা পাওনার বিষয় কি বলা যায়

বল না? আমার ত এই রকম ইচ্ছা আছে, যে হাজার টাকা নগদ, খাট বিছানা ও ৮০ ভরি সোণা, এর কমে ত আর হয় না, কেমন এই ত ঠিক!

ভজহরি। আচ্ছা, তুমি ওই বল ত—তবে তারা রাজী হলে হয়, আর একটা কথা বলিয়া রাখিও যে, আমরা ছেলের বিবাহ ও মাসের গোড়া গুড়িই দিব, যেন নড় চড় না হয়।

প্রমদা। আচ্ছা, আমি যাই, বলিগে, সে অনেকক্ষণ বসিয়া আছে, এই বলিয়া প্রমদা চলিয়া গেল এবং তাহার নিকট যাইয়া বলিল—যে মা, তোমায় অনেকক্ষণ বসিতে হইয়াছে, তা মা বাবু বলিলেন—যে হাঁ, ও মেয়েত আমাদের জানা আছে, আর আমাদের ওখানে ছেলের বিবাহ দেওয়া মত আছে, তবে মা একটা কথা তিনি বলিতে বলিয়াছেন যে, আমাদের ছেলের বিবাহ আমরা ওমাসের গোড়াগুড়িই দিব, সেটী যেন হয়।

ঘটকী। আচ্ছা, আমি বলিব যে, তাহাদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে আর তারা ওমাসের গোড়াগুড়িই বিবাহ দিবে, যেন দেরী না হয়। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের পাওনাটা কি দিতে হইবে তাহা জানিতে ইচ্ছা করিতেছি।

প্রমদা। ও আর আমরা কি বলিব, ও আমাদের কুটুম ঘর আমরা কি কিছু বলিতে পারি, আর বাবুও বলিয়া দিয়াছেন, না, আমরা কিছু বলিব না, তাঁদের যা ইচ্ছে হয় তাই তাঁহারা তাঁহাদের মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দিবেন।

ঘটকী। হাঁ, ভদ্রলোকের কথাইত এই, তবে কি জান মা, যখন তারা আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কি বলিব, আরও মনে মনে করিবেন যে, এ লোক কোন কাজের নয় এবং তারাও

ত আবার উদ্যোগ করিবে, মেয়ের বিবাহ দেওয়া ত অমনি নয়, তুমি ত জান মা?

প্রমদা। তবে শোন বাছা যখন একান্তই ঝাড়বে না তখন বলি। নগদ কিছু চাই, তা বাছা হাজার টাকার কমে আর কি বলিব। ঘড়ি ঘড়ির চেন, আংটী, খাট বিছানা, ৮০ ভরি সোণা এর কমে হইবে না আর এখানে কুটুম ঘর বলিয়া অমনি যা তা একটা ঠিক হইল, অপর যায়গায় এত কমে কিছুতেই হইত না।

ঘটকী। তা এ সব ত শুন্‌লাম, এখন আমি তবে আসি মা?

প্রমদা। সে কি হয় মেয়ে একটু মিষ্ট মুখ করিয়া যেতে হবে, এই বলিয়া তাঁহার বউমাকে বলিলেন—বউমা, ঘটকী ঠাকরুণকে একটু জল খাইয়ে দাও মা।

ঘটকী। তা ত আপনাদেরই খাচ্চি মা—আপনাদের মত দশ জনের কাছে খেয়ে দেয়েই মানুষ; অবশেষে জল খাইয়া ঘটকী বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

কিছু পরে ভজহরি বাবুর কন্যা ঘুমাইতেছিল, চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসিলেন—মা, তুমি যে এখনও এখানে বসিয়া আছ যে, কি কর্‌ছিলে মা?

প্রমদা। না মা, কি আর কর্‌ব এই তোমার শ্বশুর বাড়ী থেকে একজন ঘটকী এসেছিল, তাই তার সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম।

কন্যা। কি বল্‌লে মা? দাদার কি তবে ঐ খানেই বিবাহ স্থির হইল?

প্রমদা। হাঁ মা, তোমার বাবারও মত আছে যে, ওইখানেই যেন বিবাহ হয়।

কন্যা। তা বেশ হয়েছে মা, একটু শীঘ্র শীঘ্র দাদার বিয়েটা দাও, আর তাঁরা কি দেবেন থোবেন বল্লেন, মা ?

প্রমদা। না, তাঁরা কিছু বলেন্ নি বটে, তবে তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছেন।

কন্যা। তাতে তোমরা কি বল্লে ?

প্রমদা। আমরা বলিলাম আমাদের এই চাই। হাজার টাকা নগদ, খাট বিছানা, ঘড়ি ঘড়ির চেন, আংটী ও ৮০ ভরি সোণা, কেমন মা, ঠিক হয়নি, ওর চেয়ে কমে আর কি ছেলের বিয়ে দেওয়া চলে ?

কন্যা। তা বেশ হয়েছে, তোমরা যা ভাল বুঝবে তাই কর্‌বে ও আর আমি কি বলিব।

এ দিকে যতীন কিঞ্চিৎ আভাসে বুঝিয়াছিল যে, তাহার বিবাহের জন্য তাহার পিতামাতা বড়ই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, আরও সে দিবস ভাত খাইবার সময় যে সকল কথা শুনিয়াছিল, তাহাতে সে বুঝিয়াছিল যে, তাহার বিবাহের সম্বন্ধ ভোলানাথ বাবুর কন্যার সহিত ঠিক হইতেছে। এই কয়েক দিনের ঘটকীর যাতায়াত, পিতামাতার পরামর্শ, ভ্রাতৃজায়ার ও কনিষ্ঠা সহোদরার হাস্য পরিস্ফুট, অথচ সলজ্জ কথোপকথনের ভাব যতীনের মনে ঈপ্সিত মরম বাসনা লাভের জন্য এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি করিয়া কল্পনা সাহায্যে তাহা স্ফীত করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে চোখে এক স্বর্গীয় ভাব বিকশিত করিয়া দিল।

সে যতীন এখন আর নাই। কিন্তু এই সকলের মধ্যে তাহার মনে কেমন এক সঙ্কোচভাব, সলজ্জভাব আসিয়া পড়িয়াছে—সে কাহারও সহিত মুখ তুলিয়া তাহার স্বভাব সুলভ—উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে পারে না—যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকে। পাছে কেহ তাহার বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে, এই ভয়ে ও লজ্জায় তার মুখ ক্ষণে ক্ষণে লাল

হইয়া উঠে—সদাই একলা একলা থাকিতে ভালবাসে· এবং কে কোথায় কি কথা কহিতেছে, তাহা নিভৃতে গিয়া অপরের অলক্ষে শোনে। যদিও এই রকম কথাবার্ত্তা শুনা বড়ই ঘৃণার কথা; ইহাতে যতীন ব্যাচারীরই বা দোষ কি ? সেত ছেলে মানুষ—আমরা অনেক পোড়খেকোকেই এ ক্ষেত্রে এতদপেক্ষা হাস্যোদ্দীপক ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। যাহা হউক, তাহার পরিষ্কার আনন্দিত হৃদয়াকাশের এক কোণে একটি সরু কাল দাগের মত একখানি কাল মেঘ উঠিয়া ভবিষ্যৎ প্রলয়ের কথঞ্চিৎ সূচনা দেখাইতেছিল এবং সে ক্ষুব্ধ হইতেছিল। তাহার মনে একটা বিষয় বড়ই তোলাপাড়া করিতেছিল, সে তাহার মাতাকে তাহা বলিবার জন্য, বলিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বোঝা কমাইবার জন্য, কেবল একটি সুযোগ খুঁজিতেছিল। আজ সে সুবিধা পাইয়া তাহার সাধারণ সলজ্জভাব ত্যাগ করিল এবং এক অসাধারণ বলে বলিয়ান হইয়া তাহার মাতাকে বলিতে চলিল।

গিয়া দেখে যে, তাহার মাতা একলা একটা ঘরে বসিয়া আছেন-- সে উত্তম সুযোগ বুঝিয়া তাহার মাতাকে নির্ভয়ে অথচ তারগম্ভীর স্বরে বলিল—মা, তুমি কি আমার একটা কথা রাখ্‌বে ? না, তোমাকে তাহা রাখিতেই হইবে।

মা। কি বাবা যতীন, আগে কি কথাটাই শুনি, তারপর বল্‌ব এখন।

যতীন। না মা, সে হবে না, আগে তুমি আমার মাথায় হাত দিয়ে বল যে, হাঁ শুনব। আর যদি না শুন তা'হলে আমি বল্‌ছি আমি কখনও বিবাহ করিব না।

মা। তুই কি পাগল হলি নাকি, তোর আবার এ সব বাই ধরিল কেন যে, তোর কথা না শুন্‌লে তুই বিয়ে কর্‌বি না। আচ্ছা—আমি শুন্‌ব, তুই বল কি কথা ?

যতীন। হাঁ মা, তোমরা বোধ করি আমার কোথাও বিবাহ দিবার ঠিক করিয়াছেন। কিন্তু আমার একটী বিশেষ অনুরোধ আছে, আমি ছেলেবেলা হইতেই মনে মনে সংকল্প করিয়া আসিতেছি যে, আমার বিবাহে কন্যাপক্ষ হইতে কিছুই লইতে দিব না—এখন সেই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার, আজন্ম পরিপোষিত আশা ফলবতী করিবার, সুযোগ উপস্থিত। আমি মা তোমার কাছে আমার এ আব্দার গ্রাহ্য হইবে বলিয়া, বড় আশায় বুক বাঁধিয়া তোমার কাছে—মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহসী হইলাম। অতএব এই বিবাহ ব্যাপারে কন্যার পিতার কাছ হইতে তোমরা কিছু লইতে পারিবে না, এ যদি স্বীকার হও, তা'হলেই আমি বিবাহ করিব, আর নচেৎ নহে।

মা। যতীন, তুই বলিস্ কি, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে যে, তুই ও কথা বলিতেছিস! কেন, তোর কি মনে নেই, না চোখে দেখিস নাই, যে তোর ভগ্নির বিবাহের সময় তোর বাপকে কত ধরে দিতে হইয়াছিল। আর তোর ভগ্নির যেখানে বিবাহ হইয়াছিল, সেইখানেই তোর বিবাহ, তবে তারা যখন নিতে পেরেছেন, তখন তাঁহারা কি দিতে পারিবেন না, না আমরাই কি নিতে পারব না? আর দেনা পাওনার বিষয় ঘটকীরসঙ্গে কথাবার্ত্তা সমস্ত স্থির হয়ে গেছে, এবং তাঁহারাও দিতে প্রস্তুত আছেন, এখন কি হয়!

যতীন। মা, আমি তোমার পায়ে ধ'রে বল্‌ছি যে, তাঁরা যদি একটা অন্যায় কাজ করে থাকেন, তা'বলে মা আমরা কেন সে রকম অন্যায় কার্য্যে প্রশ্রয় দিব? আর দেখ, আমাদের বাঙ্গালি জাতির এই কারণেই এতদূর অবনতি হচ্চে, আমাদের হিন্দুদিগের উদ্বাহ ক্রিয়া ধর্ম্মরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত—ইহার উদ্দেশ্য ধর্ম্মরক্ষা,

সমাজরক্ষা ব্যতীত কিছুই নহে! ধর্ম্মরক্ষা করাই যখন বিবাহের মুখ্যতম উদ্দেশ্য, তবে সুধু ফুলমালা দিয়া বিবাহ কার্য্য সমাধা হয় না কেন মা? ধর্ম্মরূপ প্রধান ভিত্তিকে দূরে ফেলিয়া দিয়া এখন বিবাহ ব্যাপারে অর্থকে প্রাধান্যতা দিয়া কন্যার পিতা বা অভিভাকগণের উপর "এত না দিলে" বা "এই এই না দিলে" বিবাহ হইবে না, হইতে পারে না, বলিয়া বরপক্ষ হইতে এত জুলুম করা হয় কেন?

মা। এর আর জুলুম কি? এখনকার কালে ক'নের বাপকে ত মেয়ের বিয়ের সময় টাকাত ঢালিতেই হয়। অধিকন্তু আমরা মেয়ের বিবাহে ইঁহাদের যেমন দিয়াছি, ছেলের বিবাহে আমরা সেইটা আদায় পরিতেছি মাত্র।

যতীন। যাহাতে এই আদায় না করিতে হয়—এ রকম ব্যবস্থা আগে হইতে করিলে কি চলিত না? না, অর্থের সহিত, পণের সহিত সম্বন্ধ না রাখিলে, জুলুম করিয়া কন্যাপক্ষের নিকট হইতে আদায় না করিলে সুধু ফুলমালা দিয়া বিবাহ ব্যাপার মঞ্জুর হইত না? দিয়া আদায় করা অপেক্ষা একেবারে না দিয়া না আদায় করিলেই ত সকল দিক রক্ষা হয়।

মা। বাপ, আগেই বলিয়াছি এখন রীত হয়েছে, কন্যা পক্ষের নিকট হইতে কিছু লওয়া। তা তাঁরা যখন দেনা পাওনায় স্বীকার পেয়েছেন, তখন তোর কথার দরকার কি? আর তুই ত নিজে নিচ্চিস্ না, এখন কথা বাহিরে গিয়াছে, আত্মীয় কুটুম্ব, পাড়াপড়্সী, স্বজাত ও বিজাত, যখন শুনিয়াছে যে বিবাহ ঠিক হইয়াছে—এত দেনা পাওনায় স্থির হইয়াছে—তখন তোর এ পাগলামী শুনিলে লোকেই বা কি বল্‌বে—আত্মীয় কুটুম্বেরাই বা কি বল্‌বেন—নতুন

কুটুম্বেরাও বলিবেন যে, কি চ্যাঁটা ছেলে গো। তাই বলি বাপ—ক্ষ্যামা দে।

যতীন। মা, আত্মীয় কুটুম্বের কথা যখন তুলিলে, তখন বলি—পয়সা লইয়া কুটুম্ব করিলে কি যথার্থ কুটুম্ব করা হয়? না, তাঁহাদের প্রকৃত সহানুভূতি—যাহাতে পরের সুখ দুঃখ টানিয়া নিজের করিয়া লওয়া বলে—তাহা পাওয়া যায়? এ ঘোর দুর্দ্দিনে, অকালের দিনে, বিবাহরূপ পবিত্র ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কেবল কন্যাপক্ষ হইতে "দেহি-দেহি" শব্দে দোহন করিলে কুটুম্বের আত্মীয়তা বা সহানুভূতি পাওয়া যায় না, ইহা ধ্রুব সত্য। লোকে ছেলে মেয়ের বিবাহ দিয়াই ত পরকে আপন করিয়া লইত, আত্মীয় কুটুম্ব বৃদ্ধি করিত; কিন্তু আধুনিক সময়ে বিবাহের রাত্রি হইতেই দুই পক্ষের মন কষাকষি, শত্রুতা বৃদ্ধির সৃষ্টি হয়। আর তাহার জের গিয়া পড়ে সেই কোমল স্বভাবা বলিকা কন্যার উপর—সেই বালিকা—অনেক স্থলে যাহার দ্বাদশ বর্ষ এখনও অতিক্রম করে নাই বা সবে মাত্র করিয়াছে—সেই বালিকাকে শ্বশুর বাড়ীতে বাক্‌শক্তি থাকিতেও বোবা হইয়া থাকিতে হয়। তাহারা নীরবে চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া অহোরাত্র হৃদয়ে কি তুমুল সংগ্রাম করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়ে! শেষে মা বাপের খোয়ার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রস্ফুটোন্মুখ কলিকা কোরকেই বিনষ্ট হয়। আর যাহারা অবশিষ্ট থাকে, তাহাদের ত দাম্পত্য-সুখে একেবারেই বঞ্চিত হইয়া জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হয়। কি দুঃখে, কি পাপে তাহাকে এই দারুণ কষ্ট পাইতে হয় বলিতে পারি না; কিন্তু ইচ্ছা করিলে কি ইহার নিরাকরণ হয় না? ইহা ত বরের অভিভাবক অভিভাবিকাগণের হাতেই আছে। তাঁহারা যদি এই বুঝেন যে, এক জনের সর্ব্বনাশ করিয়া—সর্ব্বস্ব দোহন করিয়া—ভিটা মাটী চাটী করিয়া যে অর্থ শোষণ হয়,

সেই পয়সায়, পরের পয়সায়, কখনও কাহারও দুঃখের অবসান না আশান হয় নাই, হয় না, হইবে না। তাহা হইলে আধুনিক স্বার্থপূর্ণ বিবাহ (যাহা পূর্ব্বে নিঃস্বার্থ ছিল) দুঃখপূর্ণ না হইয়া কত সুখের আকর হইত, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ছেলের বিবাহ দেওয়া —ছেলের সুখ স্বচ্ছলতার জন্য—ইহা ত স্বীকার করিবেন ? কিন্তু যে বিবাহে ছেলের সুখ শান্তি রহিল না—পুত্রবধূ তাহার জন্য তাহার পিতামাতার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, এই মনে করিয়া কেবল দুঃখের বোঝা বহিতে থাকিল—অবসাদ মনকে গ্রাস করিয়া রহিল—এখন তাহার মানসিক স্ফুর্ত্তি আদৌ বিকাশ পাইল না—তখন তাহাদের দাম্পত্য জীবন কতদূর সুখের হইবে বা হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সেই জন্য মা আজ নির্লজ্জের ন্যায় মুখ ফুটিয়া এই সকল কথা তোমার কাছে নিবেদন করিতে সাহসী হইলাম—মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, অপর কারণে না হউক, অন্ততঃ তোমার ছোট ছেলে "তোমার যতীর" ও মুখ চাহিয়া এই দানগ্রহণরূপ কুপ্রথার প্রশ্রয় না দিয়া তাহার নিবারণ মানসে বদ্ধপরিকর হইয়া এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দাও—তাহাতে তোমার অসীম আনন্দ উপভোগ হইবে—সকলেই তোমাকে ধন্য ধন্য করিবেন এবং সেই সঙ্গে তোমার গর্ভের সন্তান আমরাও ধন্য হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিব। এতক্ষণ যতীন এক অমানুষিক বলে বলীয়ান হইয়া এই সকল কথা বলিতেছিল, তখন তাহার মুখে চক্ষে এক স্বর্গীয় ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার মাতা ঠাকুরাণী তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে এবং তন্ময় হইয়া তাকাইয়াছিলেন এবং আমাদের বোধ হয়, যতীনের কথার মর্ম্ম বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতেছিলেন।

এমন সময় যতীন বলিল—মা, তাঁহাদের বলিয়া পাঠাও যে, তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের মেয়েকে যাহা দিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে, অপর কিছুই চাহি না। এই বলিয়া যতীন মায়ের পা দুটী জড়াইয়া তাহাতে আপনার মস্তক রক্ষা করিলেন।

মাও হাত ধরিয়া ছেলেকে পদপ্রান্ত হইতে উঠাইয়া মস্তক আঘ্রাণ করিয়া সস্নেহে বলিলেন—বাবা, তোর কথাই আমি রাখিব।

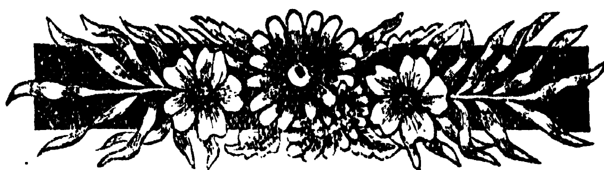
যতীনও মার পদধূলি মস্তকে দিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

যতক্ষণ চক্ষের আড় না হইল, ততক্ষণ তাহার মাতা একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিলেন এবং তাঁহার গণ্ড বহিয়া দুই একটী আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

প্রমদা কিন্তু বড়ই ফাঁপরে পড়িলেন—আগের দিনেই পুঁটির শ্বশুরবাড়ী ঘটকঠাকরুণকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, যতীনের বিবাহে এই এই চাই এবং এত দিতে হবে—আবার কি বলিয়াই বা আজ বারণ করিয়া পাঠান যে, কিছু চাই না—আবার এ ধারে না বলিয় পাঠাইলেও ছেলেও ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছে, বিবাহ করিবে না—হাজার হোক মায়ের প্রাণ তায় যতী আবার ছেলের ছোটটী—সে চিরকাল আইবুড় থাকিবে—তাহাও বা কিরূপ দ্যাখায়—পরে ভাবিয়া ঠিক করিলেন যে, বারণ করিয়া পাঠাইব—আগে আমার ছেলে, তারপর ত পয়সা। ছেলে বিগড়াইলে আমি কি পয়সা লইয়া ধুইয়া খাইব ইত্যাদি সাত পাঁচ ভাবিয়া, তাঁর এক ঝিকে ডাকাইয়া তাহাকে সব বুঝাইয়া দিয়া বলিয়া দিলেন যে, আজই একবার পুঁটির বাড়ী যা এবং তার শ্বাশুড়ীকে সব বুঝাইয়া বলবি।

প্রমদা জানিতেন যে, তাঁহার স্বামীর (ভজহরি বাবুর) এই দান না লওয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মত থাকিবে। কারণ, বরাবরই তিনি পণ গ্রহণে বড়ই নারাজ—অতএব তাঁহাকে আর কোন কথা এখন ভাঙ্গিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।



ক দিবস বৈকালে ভোলানাথ বাবু বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় তাহার ভৃত্য আসিয়া খবর দিল যে, বাটীর ভিতর মা ঠাকরুণ একবার ডাকিতেছেন।

ভোলানাথ বাবু। কেনরে, আমি যে বেরিয়ে যাচ্ছি।

ভৃত্য। আজ্ঞে, একজন ঘটকী আসিয়াছে, তাই মা ঠাকরুণ আপনাকে ডাক্‌ছেন।

ভোলানাথ বাবু। আচ্ছা, চল আমি যাচ্ছি।

ভোলানাথ বাবু ভৃত্যকে বিদায় দিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, সেই ঘটকী আবার আসিয়াছে, সেই কারণ তিনি সত্বর কাপড় ছাড়িয়া লইয়া তাহার কাছে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

ঘটকী। বাবা, আমি বরের বাটী গিয়াছিলাম, তাঁদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে, আর তাঁরা বল্‌লেন—ও ত আমাদের জানা ঘর।

ভোলানাথ বাবু। হাঁ, সে সব ত আমি বুঝলাম, যে মেয়েও পছন্দ, আর জানা ঘরও বটে ; কিন্তু তাঁরা তোমায় এ দক্ষিণার বিষয় কি বল্লেন বল দিকিন, সেটা আগে জানা দরকার।

ঘটকী। তাঁরা বল্লেন, ও আর আমরা কি বলিব, আমাদের কুটুম্ব ঘর, আমরা কি কিছু বল্‌তে পারি ? তবে শেষ বেলায় আমি অনেক জেদাজিদি করিবার পর তাঁরা বল্‌লেন যে, এই এই চাই বলিও ; হাজার টাকা নগদ, খাট বিছানা, সোণার ঘড়ি ঘড়ির চেন, আংটী, ও ৮০ ভরি সোণা।

ভোলানাথ বাবু। ও বাবা, এই কি তাদের কম, আবার বলিয়াছে কিনা কুটুম্ব ঘর, যাহা হোক, তুমি আর একদিন আসিও, আমরা ত সব শুনিলাম, পরে যাহা হয় তোমায় বলিব এখন।

ঘটকী। হাঁ, বলবে বইকি বাবা, আর তাঁরাও যে খুব বেশী চাহিয়া বলিয়াছেন তাও ত নয় তবে বাবা, এটা'ত সত্যি যে, আজকাল সচরাচর লোকে যাহা চাহে, তাহার চেয়ে অনেক কম তাঁরা বলিয়াছেন আর একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছি, বাবা ভগবান করুন, যদি তোমাদের মত হয় তাহা হইলে তারা ও মাসের গোড়াতেই বিয়ে দিবে, এটা যেন ভুল না হয়, তবে বাবা, ও মা আসি, দেখবেন যেন আপনাদের গরীব মেয়ে না মারা যায়, এই বলিয়া ঘটকী চলিয়া গেল।

ভোলানাথ বাবু তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন—কিগো, সব শুন্‌লে ত ! এখন আমি যা বলিয়াছিলাম তাই ঠিক হ'ল ত, এখন আর বসে ভাবলে কি হবে বল—মেয়ে যে বড় হয়েছে—সময় সংক্ষেপ, দেরি চলিবে না—আর জানা ঘর—তায় ছেলে পছন্দসই—যা চাইবে তাই আমাদের দিতে হবে, আর আমরাও ত লইয়াছি।

এইরূপে দুইজনে কিছুক্ষণ সুখ দুঃখের কথাবার্ত্তা কহিবার পর, তাঁহারা আপন আপন কার্য্যে চলিয়া গেলেন ; কিন্তু রাজবালার মনটা দমিয়া গিয়াছিল।

পরদিন প্রাতে ভজহরি বাবুর বাটী হইতে একজন ঝি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে একেবারে বাটীর ভিতর গিয়া যেখানে ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী কাজ করিতেছিলেন, সেইখানে যাইয়া বলিল, কি মা ঠাকরুণ ভাল আছেন ত—বাড়ীর সব ভাল ?

রাজবালা। হাঁ মা, সব ভাল, তোমাদের বাটীর খবর সব ভাল ত, আমার বউমা কেমন আছে ও কবে আসবে ?

ঝি। আপনার বউমা ভাল আছেন, আর বাড়ীর সবও ভাল আছেন, যবে আপনি বলে পাঠাবেন, সেই দিনই আমার দিদিমণি আপনাদের এখানে আসবেন—ও আর কি—তার ত এই ঘর, জন্ম জন্ম যেন হাতের নোয়া বজায় রেখে পাকা মাথায় সিঁদুর পরে এই ঘর যেন করে। তবে কি জানেন মা, বড্ড ছেলে মানুষ, সেই যা।

রাজবালা। হাঁ, তা নয় ত কি মা, আবার সেয়ানা হলে সে আপনার ঘরকন্না—নিজেই থাকবে, তখন আর যাবার নামও করবে না।

ঝি। হাঁ,—যা বলতে এসেছিলুম, আমার মা ঠাকরুণ আপনাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন যে, বলে আয় যে, "আমার ছেলের সঙ্গে আর তাঁদের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ ঠিক হইয়াছে, তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ মত আছে। আর আমরা যে দেওয়া থোয়ার বিষয় ঘটকীকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা আর আমাদের চাই না। তবে তাঁদের মেয়ে, তাঁহারা তাঁদের মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাহা দিবেন, তাতেই আমরা খুসী হইব।"

রাজ। কেন, এই যে কাল বিকালে সেই ঘটকী আসিয়া বলিয়া গেল যে, তাঁরা এর কমে বিয়ে দেবেন না আর এর মধ্যে আবার কিসে তাঁদের মতটা ঘুরিয়া গেল। কিছু বুঝতে পাচ্ছি না, তবে তাঁরা বলুন আর নাই বলুন, আমাদের হল পেটের মেয়ে, আমরা কি এমন চামার যে, মেয়েকে শুধু অমনি এক গাছি নোয়া হাতে দিয়া বিয়ে দেব, তাত আর নয়।

ঝি। হাঁ, তা না ত কি মা, কে আবার মেয়েকে কবে শুধু নোয়া হাতে দিয়া বিয়ে দিয়েছে, যারা খুব গরীব তারাও মেয়েকে কিছু না কিছু দেয়। তবে একবার কি আমাদের বউমণিকে দেখ্‌তে পাইব কি মা।

রাজবালা। হাঁ, দেখবে বই কি বাছা, এই বলিয়া তিনি সুহাসকে ডাকিলেন।

ভাবী শ্বশুর বাড়ীর ঝি বাড়িতে আসিতেই সুহাসিনী বুঝিতে পারিয়াছিল এবং বাহিরে কি কাজ করিতেছিল তাহা ফেলিয়া রাখিয়া ঘরে গিয়া অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়াছিল, পরে মাতা ডাকিতেছেন শুনিয়া, কাপড় গুছাইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া সঙ্কোচ ও একটু সলজ্জভাবে মার কাছে কাপড়ের খুঁট খুঁটিতে খুঁটিতে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুহাসিনী আসিলে তিনি বলিলেন ওগো মেয়ে এইটী তোমাদের বউমনি হইবে।

ঝি। বাঃ বেশ মেয়ে, চোখ মুখ নাক বেশ, রং ও খুব, তা একবার দেখা হল ভালই হল, তবে মা আমি আসি বেলা হয়ে গেছে, আপনাদের ত তাহা হলে ও মাসের গোড়াতেই বিয়ে দেওয়া মত ত ?

রাজবালা। হাঁ আমাদের ও মাসের গোড়াতেই বিয়ে দেওয়া মত। তা মা তুমি কি অমনি যাবে, অনেক দূর থেকে এসেছ, আবার যেতেও অনেক বেল্লা হবে, সে কি হয় দুটি ভাত খেয়ে যেতে হবে এই বলিয়া তাকে তথায় বসাইয়া বামুন ঠাকুরকে বলিলেন ওকে বেশ ভাল করিয়া সব রকম তরকারী দিয়া ভাত দেওগে আমি জল খাবার লইয়া আসছি।

যাহা হোক কিছুক্ষন পরে ঝি খাইয়া উঠিয়া বলিলেন, মা তবে আমি এখন আসি, আবার আসব এখন।

রাজবালা। হাঁ আসবে বৈকি মা এখন ত তোমাদেরি ঘর বাড়ী হইল।

যাহা হউক রাজবালা তাহার বেয়াই বাড়ীর ঝিকে বিদায় দিয়া মনে মনে ভারী খুসী হইলেন বটে কিন্তু বরেরা আমাদের নিকট কিছু চান না ইহাতেই কেমন একটা হীনতা মনে আসিয়া পড়ায় তাঁদের আত্ম সম্মানে একটু আঘাৎ লাগিতে ছিল। মনের এই চাঞ্চল্য লইয়া তাড়াতাড়ি স্বামীর নিকট চলিলেন এবং গিয়া দেখেন যে তিনি ও স্নান করিয়া আহারের জন্য নামিয়া আসিতেছেন। ইতি মধ্যে তিনি গিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, কিগো এখনও কি আহারের সময় হয়নি বুঝি ?

ভোলানাথ। কেন বল দেখি, আজ যে দেখছি কিছু বেশী রকমের খাতিরটা, আজ বোধ করি কিছু মতলব আছে—না ?

রাজবালা। হাঁ—নাও এস আর ঠাট্টার সময় পেলেনা বুঝি, বেশ,—বেলা কত হয়েছে জান এই বলিতে বলিতে উভয়ে রান্নাঘরাভি-মুখে চলিলেন, ভোলানাথ বাবু আহারে বসিলে কিছুক্ষন পরে রাজবালা বলিলেন যে ওগো আজগের দিনটা আমাদের খুব ভাল দেখছি আজ সকাল বেলাই আশাতীত রোজগার হইয়া গেল বুঝলে ?

ভোলানাথ। কি রকম রোজগারটা হোল এবং কি রকমে হোল শুনতে পাই নাকি?

রাজবালা। পাবে বই কি, ও রোজগারটায় আমার যত উপকার হোক আর নাই হোক তোমার পক্ষে খুব ভাল হইয়াছে বটে; কিন্তু আজ ভোরের বেলায় তোমার ভাবী নূতন বেয়াই বাড়ী থেকে তাঁদের ঝি আসিয়া উপস্থিত—সে বলিয়া গেল যে, "আমার বউমা, আমায় বলিয়া দিলেন যে, আমরা যে দেওয়া থোয়ার বিষয় ঘটকীকে বলিয়া দিয়াছিলাম, তাহা আর আমাদের কিছুই চাহি না। তবে আপনাদের মেয়ে, যাহা তাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দিবেন তাতেই আমরা খুসি হইয়া লইব; কিন্তু ও মাসের গোড়াতেই যেন বিবাহ দেওয়া হয়।"

ভোলানাথ বাবু কিছু ভাবিয়া বলিলেন—বল কি, তাঁহাদের আবার এ মত হল কেন, এর ভিতর নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে, যাহা হউক, এই সুখবরটায় আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম—আর এ একটা মস্ত রোজগার বটে; কিন্তু একটা কথা, তাঁহারা তাঁদের ছেলের বিবাহে কিছু না লইতে পারেন,—তাই বলিয়া আমরা কি এতই হীন যে, আমাদের মেয়েকে বিবাহের সময় কিছু না দিয়া থাকিতে পারিব, দিন আনে দিন খায়, এমন ডোম ডোকলারাও যে মেয়ের বিবাহে কিছু না দিয়া থাকিতে পারে না। তবে আমাদের সাধ্যমত এবং যাহা না দিলে বিশেষতঃ যখন আমরা কিছু দিন আগে তাঁহাদের কাছ হইতে আদায় করিয়াছি, সমাজে নাম না খারাপ হয়, মান বজায়, থাকে তাহাই দিব। সুখের বিষয় ইহাতে জুলুম রহিল না, তাহা হইলেও আমাদের আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যদি ভগবান এতই দয়া করিতেছেন, তখন আমাদের এই মাসের কয়দিনের মধ্যেই সমস্ত ঠিক করিয়া যোগাড় রাখিতে হইবে।

রাজবালা। হাঁ, আর দিন নাই বটে ; এইবার থেকে সব উদ্যোগ করা যাক্, তবে ঐ যা বলিলে—তাঁরা যদি কিছু নাই চান, আমাদের সাধ্যমত দেওয়া চাই—তাহা তোমার যা ইচ্ছা হবে তাই দিও, ও আর আমি কিছু বলিব না।

ভোলানাথ বাবু। হাঁ, সে পরের কথা পরে হবে আর যা দেওয়া হবে, সে তোমায় না জানাইয়া কিছু করিব না জানিও।

ভোলানাথ বাবু আহার করিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, ভৃত্য অমনি তামাক লইয়া আসিল। ভোলানাথ বাবুর কিন্তু মনে মনে বড় আহ্লাদ হইয়াছিল যে, যাক্ মেয়ের বিবাহে বৈবাহিকের হুকুম তামিল করিতে হইল না। আজকালের বাজারে কম সৌভাগ্যের কথা নহে !

এদিকে দেখিতে দেখিতে যতীন ও সুহাসিনীর শুভ বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল—যতীনের মা প্রমদা আধুনিক রীতি নীতির আচার ব্যবহারের তত পক্ষপাতী ছিলেন না। বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বিবাহের আনুসঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ বজায় রাখিতে সদাই সচেষ্ট। তাই তিনি পাড়ার পাঁচজনের সাহায্যে আনন্দ নাড়ু তৈয়ার করিয়াছেন, অনেক নব্যারা আনন্দ নাড়ু কি তাহা হয়ত জানেন না। আমাদের বাঙ্গালির আনন্দের তিরোভাবের সময় হইতে কোন শুভকর্ম্মে আনন্দ নাড়ুও বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। এখন বাবুদের ডিস্পেপ্সিয়া—তাহার দৌলতে এখন লুচির ফোস্কা ছিঁড়িয়া খাইতে হয়। রসগোল্লা পান্তুয়ার ছাল ছিঁড়িয়া খাইতে হয়—আমরা আর্থিক—শারীরিক ও মানসিক হিসাবে সদাই নিরানন্দ। যাহাদের প্রাণে আনন্দের লেশ মাত্র নাই—তাহারা আনন্দ নাড়ু খাইবে কি প্রকারে ?

ভজহরি বাবুর বাড়ীতে কয়দিন ধরিয়া পাড়াস্থ গ্রামস্থ অনেক চাষাভুষা লোক ছোট দাদাঠাকুরের (যতীনের) বিবাহ উপলক্ষে বামুন বাড়ীতে প্রসাদ

পাইতেছে—তাহারা আজ অন্য দিনের জল খাবার চিঁড়ে মুড়ির পরিবর্ত্তে আজ আনন্দ নাড়ু খাইতেছে ও তারিপ করিতেছে। ভিতর বাড়ী পল্লীস্থ স্ত্রীলোকদিগের কলরবে মুখরিত। যতীনের খুড়তুত, পিসতুত, মাসতুত, জাসতুত, মামাত, ভ্রাতৃজায়া সম্পর্কীয়া রমণীগণ যতীনকে আজ দুই একটা ঠাট্টা করিতেছে, যতীনও সকলের সহিত যথাযোগ্য মান্যানুসারে তাঁহাদের কোন কথার উত্তর দিতেছে—কোনটায় বা যথাযথ উত্তর না দিতে পারিয়া অপ্রতিভ হইতেছে; এই রকমে দিবা প্রায় অবসান হইয়া আসিতে লাগিল এবং বরের বিবাহ যাত্রা উদ্যোগ চলিতে লাগিল।

পাঠক পাঠিকা! আসুন, একবার আমরা ভোলানাথ বাবুর বাড়ী যাই। ক'নের বাড়ীতে বিবাহের দিন সকাল হইতেই সকলেই কোন না কোন কার্য্যে ব্যস্ত। সানাই বাজানে ওয়ালারা থামিলেই সকলেই বলে ওরে বাজা বাজা। সমস্ত লোকের ফর্‌মাস মত বাজাইতে গেলে তাদের বুকের কলজের উপর বড়ই জুলুম করা হয় দেখিয়া, ব্যাচারীরা কখনও বা ডুগী তবলায় গুঁপো বা চাঁটি দিয়া, কখনও বা শুধু পোঁ ধরিয়া জান বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে, তবে ওরি মধ্যে বাড়ীর হোম্‌রা চোম্‌রা কেহ বাজাইতে বলায়, ভাবী পুরস্কারের আশায় একটু মস্‌গুল হইয়া হইয়া এক আধখানা গানের দুই একটি কলি বাজাইয়াই রাগিণী ধরিয়া কেরামতি দেখাইতেছে। ভিতর বাটী হইতে মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি হইতেছে।

ক্রমশঃ দিবা অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। গোধূলি লগ্নে বিবাহ; অতএব সমস্ত বন্দোবস্তের শেষ বর আসিবার আগেই করিতে হইবে ভাবিয়া ও জানিয়া, কোলাহল—লোকের হুড়াহুড়ি ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। যথা সময়ে বরযাত্রী সমভিব্যবহারে যতীন বর সাজিয়া

আসিয়া উপস্থিত হইল। হৈঃ হৈঃ রৈঃ রৈঃ পড়িয়া গেল। এত গোলমালেও যতীন কিছু অন্যমনস্ক ছিল—তাহারা মানসপটে ভোলানাথ বাবুর কন্যা সুহাসিনীর—সেই জলমগ্ন সুহাসিনীর কথা—সুহাসিনীর বালিকা বন্ধুগণের আর্ত্তনাদ শুনিয়া কৌতুহল চিত্তে যতীনের পুকুর ধারে গমন, আদ্যোপান্ত ঘটনা সংক্ষেপে শুনিয়া নিমেষে ডুব দিয়া সংজ্ঞা-রহিতা সুহাসিনীকে জলরূপ কবর হইতে তীরে উত্তোলন—শুশ্রূষায় চৈতন্যোৎপাদন—সুহাসের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সলজ্জ চাহনি একে একে সকলই মানস পটে উদয় হইতে লাগিল এবং সেই যতীনের “কি জানি এক ভাবের” ক্ষীণ আশা এখন সমুদ্র সহিত মিলনেচ্ছুক ক্রমশঃ বেগবতী নদীর ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া, পরিস্ফুট হইয়া সফল হইতে চলিল দেখিয়া, এক গভীর কৃতজ্ঞতারসে তার হৃদয় আপ্লুত হইয়া ভগবৎ চরণে প্রণত হইল।

বর আসিয়া নির্দ্দিষ্ট বিছানায় বসিলেন—বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীগণের তামাক, পান ইত্যাদি দ্বারা আদর অভ্যর্থনা হইতে লাগিল। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে ভোলানাথ বাবু পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিলেন এবং কৃতাঞ্জলি করপুটে সভাস্থ সকলের অনুমতি লইয়া শুভলগ্নে কন্যা দান করিলেন। বর ক'নে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলে পর, বৈবাহিকের বিশেষ জেদা-জেদিতে কিছু জল-খাবার খাইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র সমভিব্যাহারে ও বাটী প্রত্যাগমনোন্মুখ অবশিষ্ট বরযাত্রীকে লইয়া ভজহরি বাবু চন্দননগরের বাড়ীতে আসিলেন।

ওদিকে ভোলানাথ বাবুর বাড়ীতে সম্মিলিত নিমন্ত্রিত মেয়েরা বর ক'নেকে বাসরে লইয়া গিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সুহাসিনীর বিশিষ্টা সহচরী আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা কুমুদিনী যে তথায় উপস্থিত না ছিল, এমন নহে। সে কিছুক্ষণ

যতীনের মুখের দিকে তাকাইয়া, থাকিয়া থাকিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে ছিল—কিন্তু অধিকক্ষণ না জানান দিয়া থাকিতে পারিল না—সে সাহসে বুক বাঁধিয়া যতীনকে মিঠি সুরে সম্বোধন করিয়া বলিল—কি গো বর মহাশয়, এত মাথা হেঁট করিয়া আছেন কেন? বলি, আমাদের কি চিন্তে পারেন? হঠাৎ এই প্রশ্নে চমকিত হইয়া যতীন যেমন প্রশ্ন-কারিণীর মুখের দিকে চাহিল, অমনি দেখিল যে সে আর অপর কেহ নহেন—তাঁহার নব-পরিণীতা অর্দ্ধাঙ্গিনীর প্রিয়তমা সহচরী কুমুদিনী।

যতীনও মৃদুস্বরে উত্তর দিল, তা আর মনে পড়্বে না? কুমুদিনীর এই আকস্মিক প্রশ্নেও যতীনের তৎপর হইয়া উত্তর দেওয়ায় সমবেত সমস্ত মেয়েরা কৌতূহল পরবশ হইয়া একবার যতীনের দিকে একবার কুমুদিনীর দিকে চাহিতে লাগিল—কুমুদিনী সুহাসিনীর মাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—মাসি মা, তোমার জামাই, বাছা, আমাদের অচেনা নয়।

সে তখন সকলকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল—মাসিমার জামাই আমাদের অচেনা নয়—হ্যাঁগা! তোমাদের ত মনে আছে যে, সুহাস আজ বছর দুয়েক আগে চাটুয্যেদের বাগানের পুকুরে পদ্মফুল তুল্‌তে গিয়া জলে ডুবে গেছ্‌লো— এই ইনি—তোমাদের জামাই বাবু—আজ আমাদের বর বাবু—সুহাসকে ডুব দিয়া জল হইতে তুলিয়া বাঁচান। ইনি না থাক্‌লে সুহাসের সেদিন যে কি হত, তাহা ভাবতে গেলে এখনও হৃৎকম্প হয়—ইঁহার ন্যায় পরোপকারী লোক দ্যাখা যায় না—ভগবানের বিশেষ দয়ায় নিয়তি চক্রে আজ সেই সুহাসের প্রাণদাতা যতীন বাবু ও আমাদের সুহাস সংসারক্ষেত্রে পতি পত্নী স্বরূপে সম্মিলিত হইল। যেমন উহাদের উভয়ের মনের আশা ছিল, যেন তারা দুইজনে স্বামী ও স্ত্রী হইয়া আজন্ম সুখে কাল কাটায়। পরম কারুণিক ঈশ্বর

তাহাদের সে আশা পূর্ণ করিয়াছেন। ভগবান আশীর্ব্বাদ করুন, আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন এবং আমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের কাছে এই ভিক্ষা করিতেছি যে, এরা দুটীতে চিরকাল সুখে স্বচ্ছন্দে মনের সুখে থাকে। সেখানে উপস্থিত সকলেই বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং সাধারণতঃই সকলের সহানুভূতি যতীন সুহাসের দিকে আকৃষ্ট হইল।

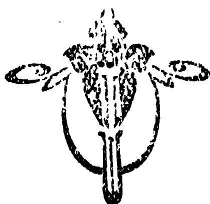
কুমুদের আহ্লাদ আর ধরে না—সে সুহাসের পাশে গিয়া কিছু মৃদুস্বরে বলিল—কি ভাই সুহাস মনে পড়ে, যখন যতীন বাবু তোমাকে রক্ষা করিয়া আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যান, তখন তোমার চোখ মুখ নীরব ভাষায় হৃদয়ের ভাব কি জানাইতেছিল? জেদাজেদী করিয়া ধরায় তখন না বলিছিলি, যদি উনিই আমার বর হন ত বেশ হয়—কেমন না? এখন ত ভাই তিনিই তোমার "চেষ্টার ফল তেষ্টার জল" বর হলেন—এখন যেন বরকে পেয়ে আমাদের ভুলে যাস্‌নি।

যতীনের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল—ওগো বোনাই বাবু, এই আমার সুহাসকে আজ আপনার হাতে সঁপে দিলুম—সে বালিকা—আমার চেয়ে দুই বছরের ছোট—তাহার দোষ গুণ মানাইয়া লইয়া শিক্ষা দিয়া তাহাকে আপনার মনের মতন করিয়া লইবেন এবং আমি যতদূর জানি, সুশি আমার আপনার মত ভাল গুরু মহাশয়ের হাতে পড়িয়া ভাল পড়ুয়া হইয়া দাঁড়াইবে।

যতীনও কুমুদের এই স্নেহের বন্যায় ডুবিয়া গেলেন। বলিলেন—দেখা যাক্, পরমেশ্বরের কৃপায় আমি আপনার হুকুম তামিল করিতে কতদূর সফল হই। তবে এখন আর একলা আপনার ভগ্নীকে নয়—তাহার সহিত আমাকেও—এ অধমকেও যেন ভুলিয়া যাইবেন না।

কুমুদ বলিল—যতীন বাবু সত্য কথা বলিতে গেলে—এখন সুহাসের চেয়ে আপনিই আমাদের অধিক স্নেহের পাত্র হইলেন, কারণ এখন সুসির মান, অপমান, অভিমান, মঙ্গলামঙ্গল সমস্তই আপনার উপর নির্ভর করিতেছে। এখন সুসির নিজের অস্তিত্ব নাই—তাহা আপনাতেই মিশাইয়া দিয়াছে। কুমুদের আনন্দ ধরে না—সে আজ যাহাতে যতীন ও সুসির কোন কষ্ট না হয়—তাহার জন্য সদাই সচেষ্ট রহিল। সমস্ত রাত্রিই নির্দ্দোষ আমোদে প্রমোদে রাত্রি কাটিয়া গেল।

পরদিন বরক'নে বিদায় হইবার সময় কুমুদকেও অজস্রধারে অশ্রুসিক্ত হইতে দেখা গিয়াছিল ; কিন্তু সে দম্পতি যুগলের ভাবী মঙ্গল কামনায় পরমপিতা পরমেশ্বরের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা করিতে বিরত হয় নাই। পরদিন যথারীতি মাঙ্গলিক কার্য্য শেষ হইলে বরক'নে বৈদ্যবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল ও কয়েক দিন আমোদ প্রমোদে কাটিয়া গেল।



উপসংহার।



উপসংহার



আমাদের এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার নায়ক যতীন ও নায়িকা সুহাসের বিবাহের পর প্রায় দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে—সুহাসের শ্বশুরালয়ে আগমনের পর হইতে প্রমদার লক্ষ্মীর সংসারের আরও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে—বধূ দুইটী প্রমদার যেন আপনার পেটের মেয়ের অপেক্ষাও বেশী স্নেহের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছ। তাঁহারা দুইটী সহোদরা ভগ্নীর মত পিতৃমাতৃতুল্য শ্বশুর শাশুড়ীর আদেশ মান্যের সহিত প্রতিপালনে সদাই যত্নবতী—তাহারা দুইজনেই সংসারের কাজ-কর্ম্ম প্রমদার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া করিতে পাইলে বড়ই আনন্দিত হয়।

ভজহরি বাবু একদিন প্রমদাকে বলিতেছিলেন—গিন্নি, বৌমারা তোমায় যেমন রান্না-বান্না ইত্যাদি সংসারের কাজ হইতে পেন্সন দিয়াছেন—আমার নরেন যতীর কল্যাণে আমাকেও সামাজিক বল, আর্থিক বল, সাংসারিক বল, কোন বিষয়েই আর বড় মাথা ঘামাইতে হয় না। তারা দুইজনে আমার কাজের আসান করিয়া দিয়াছে। আমরা মনের মত দুটী ছেলে ও ঘরের লক্ষ্মীস্বরূপিণী

বৌমা দুটীকে পাইয়া এখন মনের সুখে ঘরকন্না করিতেছি। আমাদের উপর ভগবানেয় অসীম দয়া, এমন সুখ কয়জনের ভাগ্যে হয়!

প্রমদা। আমাদের উপর ভগবানের যে কত দয়া তাহা আর কি বলিয়া জানাইব!

ভজহরি। মানুষের প্রার্থনার অন্ত নাই—অতএব তাঁর চরণে এই নিবেদন যে, যেন আমরা বুড়োবুড়ী দুইজনেই সমস্ত সংসারের ভার নরেন যতীর উপর দিয়া জীবনের বাকী কয়টা দিন কায়মনোবাক্যে ভগবৎ আরাধনায় নিয়োজিত করিয়া ছেলেদের কোলে মাথা রাখিয়া, সুস্থির হইয়া যেন ভববন্ধন মুক্ত হইতে পারি।

ভজহরি বাবু যখন এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন প্রমদা চুপ করিয়াছিল এবং তাহার চক্ষু হইতে দরদর-ধারে আনন্দাশ্রু পড়িতেছিল।

সে স্বামীর কথা শেষ হইতে না হইতেই বলিয়া উঠিল—স্বামিন্! আমি নারী—আমার নারীজন্ম তোমার মত দেবতুল্য স্বামী এবং সোণার চাঁদ দুইটী ছেলে, মনের মত দুইটী বৌমা এবং আদরের পুঁটিকে পাইয়া সার্থক হইয়াছে—এখন আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমাদের রাখিয়া আমি এই পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিতে পারি—বলিতে বলিতে সে ভজহরি বাবুর পায়ে মাথা রাখিয়া লুটাইয়া পড়িল। ভজহরি বাবু সাধ্বী সহধর্ম্মিণীকে আদরের সহিত উঠাইলেন।

সুহাসিনী ছেলেবেলা হইতেই বড় সুবোধ মেয়ে, সে কখনও অবাধ্যতার জন্য বা কোন দুষ্কর্ম্মের জন্য বাপ মার কাছে বিশেষরূপ ভৎর্সিত, তিরস্কৃত বা প্রহৃত হয় নাই। তাহার উপর যতীনের মত উপযুক্ত স্বামীর কাছে শিক্ষালাভ করিয়াছে—অতএব এক কথায় স্ত্রীলোকের যে যে গুণ থাকিলে হাজারের মধ্যে একটা হওয়া যায়,



"চাদিনী রাত্রিতে ঘরের সম্মুখস্থ ছাতের উপর যতীন ও সুহাসিনী"— পৃষ্ঠা

U. RAY & SONS

তাহা সমস্তই তাহাতে অর্শাইয়াছে। বাড়ীর কাজকর্ম্ম, রাত্রিতে তাগাদা ইত্যাদি করিতে করিতে কখনও যতীনের শুইতে আসিতে অনেক রাত্রি হইত। সুহাসিনী কিন্তু স্বামী ঘরে না আসা পর্য্যন্ত জাগিয়া কাটাইত, অপরে জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, আমার ঘুম কেমন কম—শীঘ্র ঘুম হয় না।

যতীনও মাঝে মাঝে বলিত—সুহাস, আমার আসিতে বিলম্ব হইলে কি তোমার ঘুমাইতে নাই ?

সুহাস উত্তরে বলিয়াছিল—বেশ ত বলিলে ? তুমি বাড়ী বাহিরে—একে পাড়াগাঁ—পথে কত বিপদ আছে আমি কি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারি ?

আর এক সময়ে যতীনের কয়েক দিন বাড়ী আসিতে অনেক রাত্রি হইয়াছিল, বাড়ী আসিয়া দেখে যে সুহাস আলোর কাছে বসিয়া শুপারী কাটিতেছে।

যতীন কথা-প্রসঙ্গে ঠাট্টার ছলে সুহাসকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা সুশি—আমি এত রাত্রে বাড়ীতে আসিলাম, তাহাতে আমার প্রতি তোমার মনে কি কোন সন্দেহ বা অবিশ্বাস স্থান পায় না ?

স্বাধ্বী সতী সুশি উত্তর দিয়াছিল—কি বলিলে ? তোমায় অবিশ্বাস—হৃদয়ের দেবতাকে অবিশ্বাস ? দেবতার প্রতি অবিশ্বাস করিলে কি মনে শান্তি পাওয়া যায় ? কখনই না। অতএব অবিশ্বাস না করিয়া তোমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি এবং তাহাতেই শান্তি পাই—আমার মিনতি সে শান্তি উপভোগ করিতে বঞ্চিত করিও না প্রভু।

এই উত্তরে কি এক গভীর ভাব নিহিত রহিয়াছে। যতীনকে আর এ বিষয়ে ঠাট্টা করা বন্ধ করা হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

একদা এক নিদাঘকালের জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাত্রে যতীন ও সুশী আহারের পর ছাতের উপর বেড়াইতেছিল, আর ওদিকে দক্ষিণ বাতাস মৃদুমন্দভাবে বহিতেছিল এবং উভয়ের মন স্নিগ্ধ করিয়া পুলকিত করিতেছিল। এইরূপে দুইজনে গভীর নির্জ্জন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে হাস্যপরিহাস কথাবার্ত্তায় কাটাইতেছিল।

এমন সময় হঠাৎ যতীন জিজ্ঞাসা করিল—সুহাস, বল দেখি, যে দিন ঘটনাচক্রে তোমাতে আমাতে পুকুরপাড়ে দেখা হয়, সে দিনটা কেমন আর এই আজ রাত্রে দুই জনে স্বামী-স্ত্রী রূপে মনের আনন্দে কাটাইতেছি এই বা কেমন?

সুহাসের গণ্ড আরক্তিম হইয়া উঠিতেছিল, যদিও চাঁদনী রাতে তাহা ভাল দেখিতে পাওয়া গেল না। সে বলিল, সে কথা মনে হইলে আমি যে তোমার কাছে কত ঋণী তাহাই মনে জাগরূক হইয়া উঠে, আর তাহা এ জনমে শোধ দিতে পারিব না। যদি স্ত্রীলোক হইয়াই জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন তোমার মত স্বামীর, স্ত্রী হইয়া আমার নারী-জন্ম সার্থক করিতে পারি—বলিতে বলিতে সুহাসের কথা রোধ হইয়া আসিতে লাগিল দেখিয়া, যতীন দুই হাতে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মস্তক নিজ বক্ষোপরি স্থাপিত করিলেন, চক্ষে পুলকাশ্রু বহিতে লাগিল ও গভীর শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া যতীন অনুভব করিতে লাগিল। যতীন তাহারই মুখের দিকে একদৃষ্টে স্থাপিত সুহাসের মুখখানি আবেগভরে ধরিয়া কম্পিতওষ্ঠে একটী দুইটী করিয়া কয়েকটী সস্নেহ-চুম্বন বসাইয়া দিলেন।

ঝড় কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে যতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল, মনে কর যদি তোমার সহিত আমার বিবাহ না হইত—তাহা হইলে তুমি কি করিতে?

সুহাসিনী। হিন্দুর ঘরে আজন্ম অবিবাহিতা থাকিয়া তোমার উদ্দেশে, আমার ইষ্টদেবতার উদ্দেশে, এই নশ্বর জীবন অতিবাহিত করিতাম। মনে করিতাম আমার সাধনা এখনও পূর্ণ হয় নাই বলিয়াই আমার হৃদয়ের দেবতা আমার হৃদয়াসনে সমাসীন হইলেন না—আরও কঠোর চেষ্টা করিতাম আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একজন আর একজনকে যদি নিস্বার্থভাবে ভালবাসিতে পারে, তাহাতে তন্ময় হইতে পারে, তবে সেই অপর জন এজনকে ভাল না বাসিয়া কখনই থাকিতে পারে না। মানব হৃদয়ের এইরূপ লৌহ চুম্বকের ন্যায় অদৃশ্য আকর্ষণী শক্তি, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম, ইহাই ব্যতিক্রম খুব কমই দেখা যায়।

যতীন এইরূপ উত্তর পাইয়া এই রকম গুণবতী স্ত্রী তাহার ভাগ্যে জুটিয়াছে ভাবিয়া মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল ও আনন্দ রসে তাহার মন আপ্লুত হইল।

ঘোষাল সংসারে এইরূপ সুখে দিন কাটিতেছিল—কিন্তু এই মরজগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কাহারও ভাগ্যেও ঘটে না—এই প্রাকৃতিক নিয়মেরও ব্যতিক্রম কিছু ঘটিল না।

ভজহরি বাবুর শরীর কয়েকমাস হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। আজ জ্বর, কাল পেটের অসুখ, পরশু বাত বেদনা, কিন্তু তিনি বড় পরিমিতাচারী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্যাহ্যাড়ম্বর আদৌ তিনি ভালবাসিতেন না। পুণ্যের শরীর বলিয়া তাঁহার মনের বল যথেষ্ট ছিল· নিজের অসুখে কাতর হইতে একদিনও দেখা যায় নাই। তাঁহার অসুখ বৃদ্ধি হইল—ছেলেরা, পুত্রবধুরা তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। ভাল বিচক্ষণ কবিরাজ আনান হইল—তিনি তত ভরসা দিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তিম সময় দুই পাঁচ দিনের মধ্যেই আসিবে—তাহাতে তিনি কিছুমাত্র

বিচলিত না হইয়া, একদিন নরেন, যতীন-দুই ছেলে, প্রমদা-স্ত্রী, বিমলা ও সুহাস—দুই পুত্রবধূ ও কন্যা পুঁটি ইত্যাদিকে নিকটে ডাকিয়া প্রত্যেককে যথাযোগ্য আদেশ উপদেশ সান্ত্বনা দিয়া মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

প্রমদা এই সপ্তাহ কয়েক স্বামীর শয্যা-পার্শ্বেই কাটাইতেছিলেন। এইরূপে কোন দিন একটু ভাল, কোন দিন একটু খারাপ হইতে হইতে, একদিন অসুখ বড়ই বৃদ্ধি পাইল—কবিরাজ আসিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি সজ্ঞানে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে করিতে এই শোক-দুঃখ-পাপ-তাপ পূর্ণ মরজগৎ ত্যাগ করিয়া অনন্ত-ধামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার দেহ পঞ্চভূতে মিশাইল।

ঘোষাল সংসারে এইরূপ একটা অশুভের ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে। কালে সকলের শোকের ক্রমশঃ উপশম হইতে লাগিল। স্বামী বিয়োগের পর হইতে প্রমদার মন বড়ই দমিয়া গেল—ঈশ্বর আরাধনায় দিন কাটাইতে লাগিলেন—উপযুক্তা পুত্রবধূদ্বয়ই মিলিয়া মিশিয়া সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম যথারীতি সম্পাদন করেন এবংসমস্যা ঠেকিলে দুইজনেই প্রমদার মত লইয়া কার্য্য করেন—কিন্তু অযথা শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে বিরক্ত করিতে সাহসী হয় না।

আরও কয়েক মাস পরে যতীনের একটী পুত্র-সন্তানহইল। নাতিকে পাইয়া প্রমদার শোক কতকটা উপশম হইল বোধ করা যায় কেন না—প্রমদা নাতিটিকে সদা সর্ব্বদা কোলে বুকে পিঠে করিয়া রাখেন—আদর করেন এবং একটু হাসি ঠাট্টাও করেন।

দেখিতে দেখিতে ছেলেটী দুই বৎসরের হইল—এখন সে ঠাকুরমা ভিন্ন আর কাহারও কাছে—এমন কি সময়ে সময়ে তাহার মায়ের

কাছে (সুহাসের কাছে) থাকিতে চাহিত না, এখন সে মা মা বলে—হাঁটিতে শিখিয়াছে।

একদিন যতীন আহারাদির পর নিজের ঘরে তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আছে, আর তাহার সম্মুখে তাহার স্ত্রী ছেলেকে লইয়া খেলা করিতেছে ; এমন সময় সুহাসের বাল্য-সহচরী কুমুদিনী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুহাসিনী তাহাকে দেখিয়া গিয়া পরমানন্দে যত্ন করিয়া বসাইল এবং জিজ্ঞাসা করিল—কি ভাই কুমো—তোমাদের সব ভাল ত? তোমার কর্ত্তা (যোগেশ বাবু) কেমন আছেন ? ছেলে মেয়ে কেমন আছে ? তুমি ভাই কেমন আছ ?

কুমুদ তাড়াতাড়ি খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া চুমো খাইতে লাগিলেন—খোকাও অবাক হইয়া তাহার মুখ পানে ও মা বাপের মুখ পানে চাহিতে লাগিল।

পরে বলিল—তুই জ্বালালি সুশি—একেবারে প্রশ্নের সারি সারি কেয়ারী বসাইয়া দিলি যে—আর জিজ্ঞেস করিবার কিছু বাকী আছে কি ? দাঁড়া—এই এলুম অনেক দিনের পরে—একটু স্থির হই—খোকামণিকে আদর করি, এই খোকার বাবার (যতীনের দিকে আড়ে চাহিয়া) সহিত দুইটা কথাবার্ত্তা কই। আচ্ছা—আমার ভাই এখন আপাততঃ এক রকম মঙ্গল। এখন শুনলি ?

পরে যতীনকে লক্ষ্য করিয়া কি গো যতীন বাবু, কেমন আছেন আপনি ?

কুমুদের এরূপ অভাবনীয় আগমনে যতীনও মহা আনন্দিত হইয়া বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া কুমুদকে কি রকমে খাতির করিবেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন এবং কুমুদের এই প্রশ্নে বলিলেন—আমার

সহিত এ অধমের বাটীতে এ সময়ে যে সাক্ষাৎ লাভ হইবে, তাহা স্বপ্নের অগোচর। বলিতে পারি না—কাহার মুখ দেখিয়া আজ সকালে উঠিয়াছিলাম।

কুমুদ। কাহার মুখ দেখিয়া আর উঠিবেন—যার মুখ দেখে রোজ রোজ উঠেন—এই যে, এই আমার সুশীর—এই বলিয়া সুশির মাথার কাপড় সরাইয়া দিয়া চিবুক ধরিয়া যতীনকে দেখাইলেন।

সুশী কুমুদের হাত ছাড়াইয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া বলিল—তুই ভাই বড় দুষ্ট—যেমন দুষ্ট ছেলেবেলায় ছিলে, এখনও কিছু কম্‌তি হয় নাই।

যতীন। তিনি কেমন আছেন?

কুমুদ। হাঁ, আছেন এক রকম।

যতীন। আপনার ছেলে মেয়ে কেমন আছে?

কুমুদ। তাহারা আপনার আশীর্ব্বাদে ভাল আছে বলিয়া সুশীর কাণে কাণে ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা কহিতে আরম্ভ করিল।

সুশী। না, তা হবে না—না, তা হবে না।

কুমুদ। সে যাহা হউক, আজ বড় তাড়াতাড়িতে আসিয়াছি ভাই—আর একদিন সুবিধাক্রমে আসিব।

যতীন। আবার কবে আমাদের কপাল ফিরিবে, আপনার সুবিধা হইবে, তবে আসিবেন—সে এখন বহুত দূর। যখন দয়া করিয়া আসিয়াছেন, তখন বাল্য সহচরীর সহিত দু দণ্ড কথাবার্ত্তা কহিতে থাকুন। এখন কি কর্ত্তাকে পাইয়া আমাদের সকলকেই ভুলিতে হয়?

কুমুদ। তা মহাশয়—কর্ত্তাকে পাইয়া অপর সকলকে সময়ে সময়ে একটু ভুলিতে হয় বই কি? আপনি যেমন সুশীর প্রাণ বাঁচাইয়া তাহার প্রাণটী একেবারে কিনিয়া মৌরসি করিয়া লইয়া, নিশ্চিন্ত

হইয়াছেন—কিন্তু আমার কর্ত্তার মনটি আমার দিকে টানিয়া আমার হেপাজতে রাখিতে আমার অনেক কাঠ খড় খরচ হয় ও সময়ও যায়—সেইজন্যই কর্ত্তাকে দেখিলে মাঝে মাঝে অপর সকলকেই ভুলিয়া যাই। এতে আপনারা আমার দোষই দিতেছেন, কিন্তু এ দোষের হাত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। মোটের উপর—যতীন-সুশীার আন্তরিক যত্নে কুমুদকে বাধ্য হইয়া সেই দিন দিবা—চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের ব্যবস্থায় ভোগ বসাইতে হইয়াছিল।

সুশীার বিবাহের অগ্রেই কুমুদের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। তাহার স্বামী যোগেশ বাবুও বেশ আমুদে লোক ও কুমুদেরই উপযুক্ত স্বামী।

এই দম্পতি-যুগল পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও স্নেহের বাঁধনে এই দুঃখময় ; মরুময় জীবনে যেন ওয়েসিসের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার ছেলে মেয়েরাও কুমুদের শাসনে ও যোগেশ বাবুর শিক্ষায় ভালভাবেই লালিত পালিত হইতেছে। ভবিষ্যৎ জীবন তাহাদের ভাল হইবে, এইরূপ আশা করা যায়।

সময়ে যোগেশ বাবুর সহিত আমাদের যতীনের বেশ সম্প্রীতি জন্মিল। ক্রমশঃ মেশামেশিতে পরস্পরের ছেলে মেয়েদের মধ্যেও একটু সৌহার্দ্দভাব স্বভাবতঃ দাঁড়াইয়া গেল। মোটের উপর দুই সংসার সুখের বন্যায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আসুন, পাঠক পাঠিকা! আমরাও "**সুখের-মিলন**" দেখিয়া যবনিকার অন্তরালে গমন করি।

